শ্রীঅরবিন্দ

এই বিশ্বের প্রহেলিকা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

প্রকাশকের নিবেদন

যোগ কিম্বা অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে শিষ্যমণ্ডলী অথবা জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর নিয়েই এই গ্রন্থ। রচনাগুলি সকলেরই উপভোগ্য হতে পারে, তাছাড়া এগুলি আধ্যাত্মিক জীবন ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও বটে, তাই সবকটি রচনা একই শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত করে মুদ্রিত করা হল।

সূচীপত্র

এই বিশ্বের প্রহেলিকা

তদপেক্ষা অনেক বড় সত্য

আমি এই কথা বলিতে বুঝিয়াছিলাম পৃথিবীতে অতিমানস-চেতনার অবতরণ, অতিমানস-সত্যের নিম্নে অবস্থিত সকল সত্যই (এমন কি, মনোভূমির উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্য অবধি, যাহা অপেক্ষা উচ্চ সত্য আজও ভুবনে প্রকট হয় নাই) তাহারা হয় আংশিক, নয়ত আপেক্ষিক, নয়ত অন্যপ্রকারে অপূর্ণ এবং পার্থিব জীবনকে রূপান্তরিত করিতে অক্ষম, তাহারা ইহজীবনকে, বড়জোর, কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত বা প্রভাবান্বিত করিতে পারে। অতিমানস-বিজ্ঞান হইল সেই বিরাট ঋত-চিৎ, যাহার কথা প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত এই অতিমানসের একটু-আধটু অস্পষ্ট দর্শন মাত্র পাওয়া গিয়াছে, কখনও বা একটা গৌণ প্রভাব বা চাপ অনুভূত হইয়াছে, কিন্তু কখনই ইহা নিম্নে পার্থিব চেতনার মধ্যে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এইরূপ অবতরণই হইল আমাদের যোগের লক্ষ্য।

কিন্তু নিষ্ফল বুদ্ধিগত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল। অতিমানস যে কি, তাহা মানবের মনোবুদ্ধি উপলব্ধি পর্য্যন্ত করিতে পারে না, অতএব, যাহা সে জানে না সে-সম্বন্ধে তাহাকে তর্কবিতর্ক করিতে দিয়া লাভ কি? যুক্তিতর্কের দ্বারা নয়, বরং অবিরাম অভিজ্ঞতার দ্বারা চেতনার বৃদ্ধির দ্বারা এবং দিব্য জ্যোতির মধ্যে চেতনার প্রসারের দ্বারা মানুষ পৌঁছিতে পারে বুদ্ধির ঊর্দ্ধে অবস্থিত সেই সমস্ত উচ্চতর চেতনা-ভূমিতে, যেখান হইতে দিব্য অতিমানস রূপায়ণ তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ করিবে।

এই সমস্ত স্তর এখনও অতিমানস-ভূমির নিম্নে অবস্থিত, কিন্তু তাহারা ঊর্দ্ধ্বভূমির জ্ঞানের কিছু কিছু লাভ করিতে পারে।

বৈদিক ঋষিগণ সমগ্র পৃথিবীর জন্য অতিমানস-ভূমি কখন প্রাপ্ত হন নাই, হয়ত চেষ্টাও করেন নাই। ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁহারা বিজ্ঞান ভূমিতে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোনদিন অতি-মানস তত্ত্বকে নামাইয়া আনেন নাই, তাহাকে পার্থিব চেতনার চিরন্তন অঙ্গ করিয়া লন নাই। উপনিষদে এরূপ সব শ্লোকও আছে যাহা নির্দ্দেশ করিতেছে যে পার্থিব দেহ লইয়া সূর্য্যতোরণের মধ্য দিয়া যাওয়া যায় না (সূর্য্য হইল অতিমানস সত্যের প্রতীক)। এই কথা বুঝিতে না পারিবার জন্যই ভারতের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা মায়াবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আমাদের যোগ হইল উত্তরণ ও অবতরণের দ্বয়ী গতি ; সাধক চেতনার উচচ হইতে উচচতর স্তরে উঠিয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নামাইয়া আনে সেই সমস্ত ভূমির শক্তিকে শুধু মন প্রাণের মধ্যে নয়, পরিশেষে জড়দেহের মধ্যে অবধি। এই সমস্ত ভূমির মধ্যে সর্ব্বোচচটি সাধকের লক্ষ্য, তাহাই হইল অতিমানস-বিজ্ঞানভূমি। যখন এই অতিমানস তত্ত্বকে নামাইয়া আনিতে পারা যাইবে, শুধু তখনই পার্থিব চেতনার দিব্য রূপান্তর সম্ভবপর হইবে।

৪-৫-৩০

ভাগবত তত্ত্বচয়

আমার মনে হয় না যে আধ্যাত্মিক ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের কোন একটা ধারার সহিত অন্য একটা ধারার সম্বন্ধ যথাযথ নির্দ্ধারিত করা যায়। বিষয়বস্তু সবগুলিরই এক, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃষ্টির ব্যাপ্তি বিভিন্ন—দৃষ্ট এবং অনুভূত বস্তুর মানসিক ধারণাচয়ও বিভিন্ন—উপযোগিতার দিক দিয়া উদ্দেশ্যও বিভিন্ন, এবং সেই কারণে কল্পিত, নির্দ্ধারিত ও অনুসৃত পথও বিভিন্ন ; এই ধারাসমূহের প্রত্যেকটী ভিন্ন প্রকারের, প্রত্যেকটী নিজের পদ্ধতি-প্রণালী গড়িয়া লইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় ধারাতে কেবল একটী ত্রয়ী ভাগবত তত্ত্ব আছে, সচ্চিদানন্দ। অথবা তুমি যদি পরার্দ্ধকে ভাগবততত্ত্ব বল, তাহা হইলে তাহার তিনটি স্তর আছে,—সৎ-এর ক্ষেত্র, চিৎ-এর ক্ষেত্র, আনন্দের ক্ষেত্র। বিজ্ঞানভূমিকে ইহার চতুর্থ স্তর বলিতে পার, কেন না উহা অপর তিন ভূমির দ্বারা পুষ্ট এবং পরার্দ্ধের অন্তর্গত। ভারতীয় ধারাগুলি চেতনার দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক স্তর ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ করে নাই, একটী যাহাকে আমরা অধিমানস বলিতে পারি, অপরটী যথার্থ অতিমানস দিব্যবিজ্ঞান। সেই জন্য ইহারা মায়া (অধিমানস শক্তি বা বিদ্যা-অবিদ্যা) সম্বন্ধে গণ্ডগোল করিয়াছিল এবং মায়াকেই পরম সৃজনী শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে, যাহা এখনও অর্দ্ধদীপ্ত মাত্র, সেইখানে থামিয়া গিয়া তাহারা রূপান্তরের রহস্যকে হারাইয়া ফেলিল—যদিচ বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক যোগ উহাকে আবার খুঁজিয়া পাইবার জন্য অনেক

হাতড়াইয়াছিল এবং মাঝে মাঝে প্রায় সন্ধান পাইয়াছিল। মোটকথা. এই ভ্রমই সচল দিব্য সত্য আবিষ্কারের সকল চেষ্টা ব্যাহত করিয়াছে। এমন কোন চেষ্টার কথাই আমি জানি না যাহা অধিমানস দীপ্তির অবতরণ অনুভব করিবা মাত্র তাহাকে যথার্থ দিব্যজ্ঞানেব জ্যোতি বলিয়া ধরিয়া লয় নাই ; ফলে সাধক হয় সেইখানেই থামিয়া গিযাছে, আর অগ্রসর হইতে পারে নাই. নয়ত ধরিয়া লইয়াছে যে ইহাও শুধু মাযা বা লীলা বই কিছু নয়. এবং তাহার একমাত্র করণীয় হইল এই ভূমি অতিক্রম করিয়া পবব্রহ্মের কোন অচল নিষ্ক্রিয় নীরবতার মধ্যে প্রবেশ করা।

তবে হয়ত. ভাগবত তত্ত্বরাজি বলিতে যে-অর্থ করা যায়, তাহা হইল বরং বর্ত্তমান বিশ্বভুবনের মূল তত্ত্বত্রয়। ভারতীয় ধারাতে এই তিন তত্ত্ব ঈশ্বর, শক্তি ও জীব, অথবা সচ্চিদানন্দ, মায়া ও জীব। কিন্তু আমাদের যোগধারাতে আমরা সহজেই এই তত্ত্বত্রয়কে ধরিয়া লইতে পারি এবং তাহাদিগকে দেখিতে পারি তিন সর্ব্বোচ্চ চেতনাভূমির দৃষ্টিতে—আনন্দ (তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত সৎ ও চিৎ তত্ত্ব সহ), অতিমানস ও অধিমানস—ইহাদিগকে বলিতে পারি ভাগবততত্ত্বত্রয়। অধিমানস অধিষ্ঠিত অপরার্দ্ধের মাথার উপরে, এবং তোমাকে অতিমানসে পৌঁছিতে হইলে এই অধিমানস ভূমির মধ্য দিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। অতিমানস বিজ্ঞান ভূমির উর্দ্ধে, তাহার পরস্তাৎ অধিষ্ঠিত সচ্চিদানন্দময় জগৎসমূহ।

তুমি অধিমানসের নিম্নে অবস্থিত গহ্বরের কথা বলিতেছ। কিন্তু মানব-চেতনা ছাড়া আর কোন গর্ত্ত আছে কি ? চেতনার সমুদয় ক্ষেত্র ও স্তর-পরম্পরার মধ্যে কোথাও একটা যথার্থ গহ্বর নাই, সর্ব্বত্র স্তরের সহিত স্তরের যোগ আছে, সাধক ধাপে ধাপে উঠিতে পারে। মানব-

মনের ও অধিমানসের মাঝে অনেকগুলি দীপ্ত হইতে দীপ্ততর ভূমি আছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশগুলির সম্বন্ধে মানুষ সচেতন নয় (কেবল নিম্নতম দুই একটির সহিত আমাদের মনের সোজাসুজি কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ আছে) ; সেইজন্য আমাদের মন ইহাদিগকে একটা উর্দ্ধতম নিশ্চেতনার ক্ষেত্র বলিয়াই ভাবিতে চায়। ফলে একটি উপনিষদে ঈশ্বর-চৈতন্য সুষুপ্তি বা গভীব নিদ্রা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; কেন না মানুষ সাধারণতঃ ইহার মধ্যে প্রবেশ করে সমাধির অবস্থাতে, যতদিন সে তাহার জাগ্রত চেতনাকে একটা উচচতব চৈতন্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়াছে।

সত্তা ও তাহার অঙ্গসমূহে একই সঙ্গে দুইটি ধারা ক্রিয়াশীল রহিয়াছে ; প্রথমটি চৈত্যপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া একটার পব একটা বৃত্ত বা কোষের আকারে ; দ্বিতীয়টি খাড়া, উর্দ্ধমুখী ও অধোমুখী, সিঁড়ির ধাপের মত, একটার পর একটা ভূমি, মধ্যপথে অধিমানস-অতিমানস ভূমি, যাহার মধ্য দিয়া মানবস্তর হইতে দিব্যস্তরে উঠিতে হয়। এই যে সঙ্গীন স্তর-উত্তরণ, ইহার সঙ্গে যদি দিব্য রূপান্তর আনিতে হয় ত তাহার একটীমাত্র উপায়, একটীমাত্র পথ। প্রথমে চিত্তকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে, ভিতরে চলিয়া যাইতে হইবে চৈত্যপুরুষের সন্ধানে, এবং সেই পুরুষকে সম্মুখে আনিতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে প্রকট করিতে হইবে আন্তর মন, আন্তর প্রাণ এবং প্রকৃতির আন্তর শরীরাংশগুলিকে। তারপর আবশ্যক একটা উত্তরণ, বার বার উর্দ্ধমুখে উঠিয়া যাওয়া। আবার অধোমুখে নামিয়া আসা অধস্তন অঙ্গচয়ের রূপান্তর সাধনের জন্য। যখন সাধক অন্তরের পানে ফিরিয়াছে তখন তাহার সমগ্র অধস্তন সত্তা চৈত্যপুরুষের কাছে নিবেদিত

হইয়াছে এবং দিব্যরূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ঊর্দ্ধে উঠিয়া সাধক যখন তাহার মানুষী মনকে অতিক্রম করে, তখন উত্থানের প্রতি-স্তরে সে একটা নূতন চৈতন্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই চৈতন্য তাহার সমগ্র সত্তার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। এইরূপে বুদ্ধির ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইয়া দীপ্ত উচ্চতর মনের মধ্য দিয়া বোধির চেতনাতে প্রবেশ করিলে আমরা সব-কিছুকে দেখিতে আরম্ভ করি আর বুদ্ধির শিখরশ্রেণী হইতে নয়, বুদ্ধিরূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া নয়, পরন্তু বোধির একটা উচ্চতর কূট হইতে, একটা বোধিগত সঙ্কল্প, অনুভব, আবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ভৌতিক সংস্পর্শের মধ্য দিয়া। এইরূপে বোধি হইতে উচ্চতর একটা অধিমানস চূড়া প্রাপ্ত হইলে আবার একটা নূতন পরিবর্ত্তন আসে—আমরা সব-কিছুকে দেখি, অনুভব করি, অধিমানস চৈতন্য হইতে এবং এমন কি এক নূতন দেহ-মন-প্রাণ-হৃদয়ের মধ্য দিয়া, যাহা অধিমানসের ভাবনা, দৃষ্টি, সঙ্কল্প, অনুভব, ইন্দ্রিয়বোধ এবং শক্তির খেলা ও স্পর্শদ্বারা পরিপূরিত। কিন্তু চরম হইল অতিমানস রূপান্তর; একবার তাহা প্রাপ্ত হইলে, একবার প্রকৃতি বিজ্ঞানময় হইলে আমরা অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়াছি, তখন আর চেতনার দিক-পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক, যদিচ দিব্য প্রগতি, একটা অন্তহীন পরিণতি তখনও সম্ভবপর।

১৬-৪-৩১

স্তরবিন্যস্ত জগৎসমূহ

জগৎসমূহের বা ভূমিচয়ের স্তরবিন্যাসকে যদি আমরা সমগ্রভাবে নিরীক্ষণ করি ত তাহাদিগকে দেখিতে পাইব একটা বিশাল, জটিল, কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ গতিধারারূপে ; উচচতর নিম্নতরের উপর চাপ প্রয়োগ করিতেছে ; নিম্নতর সেই চাপের উল্টা চাপ দিতেছে এবং নিজ স্বভাবের রীতি অনুসারে ফুটাইয়া তুলিতেছে বা ব্যক্ত করিতেছে এমন সব শক্তি ও ক্রিয়া যাহা উর্দ্ধ্বতনের শক্তি ও ক্রিয়ার অনুরূপ। জড় বিশ্ব প্রাণশক্তিকে বিকশিত করিয়াছে প্রাণভূমি হইতে অবতীর্ণ চাপের বশ-বর্ত্তী হইয়া, মনোবৃত্তিকে জাগাইয়াছে মনোভূমির চাপের বশে। এখন জাগাইতেছে বিজ্ঞানভূমির চাপের বশবর্ত্তী হইয়া অতিমানস বিজ্ঞানকে। আরও বিশেষভাবে দেখিলে. উর্দ্ধ্বতন লোকের বিশিষ্ট সব শক্তি, গতি, সামর্থ্য, সত্তা, অধস্তন ক্ষেত্রের উপর আপনাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে সেখানে যথাযোগ্য অনুরূপ রূপরাজি স্থাপিত করিবার জন্য, যে রূপসমুদয় সেই সব উর্দ্ধ্বলোকের তত্ত্বচয়কে জড়ভূমির সহিত সংযুক্ত রাখিবে এবং ইহভূমিতে তাহাদিগের ক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন করিবে। সেইজন্য এখানে সৃষ্ট প্রত্যেকটী বস্তুর সাথে সাথে অব-লম্বনস্বরূপ রহিয়াছে তাহার নিজের সূক্ষ্মতর রূপ বা কোষ, যাহা তাহার ক্রিয়ার আধার এবং সেই ক্রিয়াকে সংলগ্ন করিতেছে উর্দ্ধ্ব হইতে ক্রিয়মাণ শক্তিচয়ের সহিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষের স্থূল ভৌতিক দেহ ছাড়াও সূক্ষ্মতর কোষ বা দেহসমূহ আছে যাহাদের আশ্রয়ে সে আবরণের আড়ালে

অতিভৌতিক চেতনাভূমিরাজির সরাসরি সংস্পর্শে থাকে, এবং সেই সমস্ত ভূমির শক্তি, গতি ও সত্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে। এখানে প্রাণক্ষেত্রে যাহা কিছু ঘটে তাহার পশ্চাতে সর্ব্বদাই রহিয়াছে সূক্ষ্ম প্রাণভূমিগত পূর্ব্বতন গতি ও রূপরাজি ; মনোমধ্যে যাহা ঘটে তাহার পশ্চাতেও তেমনই সূক্ষ্ম মনোভূমিগত পূর্ব্বতন গতি ও রূপসমূহ রহিয়াছে। আমরা একটা সচল যোগপথে যতই অগ্রসর হই, ততই ঘটনাবলীর এই ভাব সুস্পষ্ট, সনির্ব্বন্ধ ও আবশ্যকীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তথাপি এই সমস্ত ব্যাপারকে একান্ত অটল যান্ত্রিক ভাবে লইলে চলিবে না। ইহাদিগকে লইতে হইবে একটা বিশাল নমনীয় গতিবৃত্তি বলিয়া, যাহার মধ্যে নানাপ্রকার সম্ভাবনার খেলা চলিতে পারে, যাহাকে চেতনার মধ্যে ধরিতে হইবে একটা নমনীয় ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির দ্বারা। ইহাদিগকে গণিতের বা তর্কশাস্ত্রের মত অচল অটল বিধানে পরিণত করা যায় না। এই নমনীয়তা আমরা যাহাতে ভুলিয়া না যাই সেইজন্য দুই তিনটি কথার উপর জোর দিতে হইবে।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক ভূমি, উপর-নীচের অপর ভূমিচয়ের সহিত সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও, আপনাতে আপনই একটা জগৎ—তাহার নিজস্ব শক্তি, গতি, সত্তা, রূপ, আদর্শ, সব রহিয়াছে যেন তাহার নিজের জন্য, তাহার নিজের বিধান অনুযায়ী, তাহার নিজের অভিব্যক্তির নিমিত্ত, মনে হয় যেন অপবাপর ভূমিরাজির সহিত এসবের কোন সম্পর্ক নাই। যথা, যদি আমরা প্রাণভূমি বা সূক্ষ্মভৌতিক ভূমির দিকে নজর করি ত তাহার বহু স্তর (অধিকাংশই) দেখিব, দেখিব যে তাহারা আপনাতে আপনই রহিয়াছে, তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই জড়জগতের সঙ্গে বা

এমন কোন গতিবিধি নাই যাহা ঐ জগৎকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে—নিজবেগে ঐ জগতের পরিবেশে একটা উচচতর ধারার রূপসৃষ্টি ত করিতে পারেই না ! বড় জোর এইটুকু বলা যায় যে প্রাণময় বা সূক্ষ্মভৌতিক বা অপর কোন ভূমিতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে জড়জগতে তাহার অনুরূপ একটা অভিব্যক্তির গতিধারা উৎপন্ন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই অচল বা প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে একটা সচল সামর্থ্যে কিংবা একটা বাস্তব সৃষ্টিপ্রেরণাতে পরিণত কবিতে হইলে আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। সেই "আরও কিছু" হইতে পারে একটা আহ্বান জড়ভূমি হইতে, যথা ভৌতিক স্তরের কোন শক্তি বা সত্তা অতিভৌতিক শক্তি বা জগৎ বা জগতের অংশের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাকে পার্থিব জীবনে নামাইয়া আনিবাব চেষ্টা করিতেছে। অথবা হইতে পারে যে প্রাণময় বা অপর কোন ভূমিরই একটা প্রণোদনা, যথা একটা প্রাণময় সত্তা তাহার কার্য্যকে পৃথিবীর দিকে প্রসারিত করিয়া সেখানে নিজের একটা রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, কিংবা সে তার নিজভূমিতে যে শক্তি-চয়ের প্রতীক সেই শক্তিচয়ের খেলা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অথবা হইতে পারে যে ইহা একটা ঊর্দ্ধ্ব হইতে চাপ ; ধরা যাক, কোন অতিমানস বা মানস-শক্তি তাহার রূপায়ণকে উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া প্রাণভূমিতে গতি ও রূপরাজি সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের মধ্য দিয়া জড়জগতে নামিয়া আসিয়া আপনাকে প্রকট করিবে বলিয়া। অথবা হইতে পারে যে এই সমস্ত বস্তু একসঙ্গে কাজ করিতেছে ; এরূপ হইলে একটা পরিণামী সৃষ্টিকার্য্যের সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

তারপর, ইহার ফল এইরূপ হয় যে প্রাণময়ের কিংবা অপর ঊর্দ্ধ-ভূমির ক্রিয়ার একটা অংশের মাত্র পার্থিব জীবনের সহিত সম্পর্ক থাকে। তবে এটুকুও এত অধিক পরিমাণে নানা সম্ভাবনারাজি লইয়া আসে যে তাহার অতি অল্প ভাগই পৃথিবী একসঙ্গে প্রকট করিতে পারে। অথবা তাহার অপেক্ষাকৃত অনমনীয় ধারার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। এই সম্ভাবনারাজি সবগুলি সিদ্ধ হয় না ; কতকগুলি ত একেবারে লোপ পায় একটা ধারণামাত্র বাকী রাখিয়া ; সে ধারণাও কোন কাজে লাগে না ; আবার কতকগুলি আছে যাহারা খুব চেষ্টা করে কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয় ; কিছুকাল কাজ চলে বটে তবে ফল হয় না কিছুই। আবার কতকগুলি সম্ভাবনা আছে যাহারা অর্দ্ধেক সিদ্ধ হইতে পারে ; এইরূপই বেশীর ভাগ সময়ে ঘটে ; তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে প্রাণময় ও অপরাপর অতিভৌতিক শক্তিচয় সংঘর্ষের মধ্যে আসিয়া পড়ে, এবং তাহাদিগকে শুধু যে জড় পদার্থ ও ভৌতিক চেতনার ব্যাঘাত অতিক্রম করিতে হয়, তাহা নয়—পরস্পরের যে বাধাবিঘ্ন তাহাও অপসারিত করিতে হয়। পরিশেষে কয়েকটি সম্ভাবনা এরূপও আছে যাহারা পরিণামে কৃতকার্য্য হয়, একটা পূর্ণতর সৃষ্টি লইয়া আসিতে পারে ; এই সৃষ্টিকে উচ্চভূমির মূল বস্তুর সহিত তুলনা করিলে একটা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের মত দেখা যায়, অথবা মনে হয় যেন ইহা জড়ভূমিতে অতিভৌতিক ব্যাপারের হুবহু প্রতিচ্ছবি। তথাপি এই সাদৃশ্যও শুধু প্রতীয়মান। বস্তুতঃ আধার ও ছন্দভেদে অভিব্যক্তিও বিভিন্ন। একটা অভিনব কিছু প্রকট হইয়াছে, এবং সেই নূতনত্বের জন্যই সৃষ্টির কদর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পৃথিবীতে অতিমানস সৃষ্টির কি উপকারিতা

থাকিবে যদি তাহা ঠিক অতিমানসভূমিগত অতিমানস সৃষ্টির মতই হয় ? মূলনীতির দিক দিয়া উভয় বস্তুই এক, তথাপি অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন ; ইহা ভগবানের একটা মহান্ নবীন আত্মপ্রকাশ নবীন পরিবেষ্টনে।

অবশ্য ভৌতিকেব সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটস্থ ও সর্ব্বাপেক্ষা সদৃশ হইল সূক্ষ্মভৌতিক। তথাপি পরিবেশ বিভিন্ন, বস্তুও বিভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূক্ষ্ম ভৌতিকেব এরূপ একটা স্বাতন্ত্র্য, নমনীয়তা, তীব্রতা, সামর্থ্য, বর্ণ এবং উদার বহুমুখী ক্রিয়া আছে, যাহার এই পৃথিবীতে থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই। (সহস্র সহস্র বস্তু সেখানে আছে, যাহা এখানে নাই)। তথাপি এখানে এমন এক বস্তু আছে, ভগবানের এমন একটা সামর্থ্য আছে, যাহা, বৃহত্তর স্বাধীনতা সত্ত্বেও, সূক্ষ্ম ভৌতিকে নাই—এমন বস্তু, যাহার জন্য সৃষ্টিকার্য্য দুরূহ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে শ্রম সার্থক হয়।

১-৯-৩০

উর্দ্ধমুখী ও অধোমুখী গতিবিধি

এই দুই গতিধারা, যাহাদের প্রতীয়মান বিরোধ তোমার মনে ধাঁধা লাগাইতেছে, তাহারা একই চেতনার দুই প্রান্ত ; তাহাদের ক্রিয়া, এখন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, অবশ্যই একদিন এক হইবে, যদি জীবনীশক্তিকে পাইতে হয় আরও নিখুঁত ক্রিয়া ও সার্থকতা, কিংবা সেই রূপান্তর যাহার প্রতীক্ষা আমরা করিতেছি।

প্রাণময় সত্তা, তদন্তর্গত জীবনীশক্তিসহ, হইল এক প্রান্ত ; অপর প্রান্ত হইল উচচতর চেতনাব একটা প্রচ্ছন্ন সচল শক্তি, যাহার মধ্য দিয়া ভাগবত সত্য কাজ করিতে পারে, প্রাণময় সত্তা ও তাহার জীবনী-শক্তিকে ধরিয়া তাহাদিগকে ইহলোকে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারে।

প্রাণভূমিগত জীবনীশক্তি হইল জড়জগতে ও জড়প্রকৃতিতে দিব্যশক্তির ক্রিয়ার অপরিহার্য্য যন্ত্র। অতএব যখন এই প্রাণসত্তা রূপান্তরিত হইয়া ভাগবত শক্তির শুদ্ধ সমর্থ যন্ত্রে পরিণত হয় তখনই ভাগবত জীবন সম্ভবপর হয়। শুধু তখনই জড়প্রকৃতির রূপান্তর সাধিত হইতে পারে এবং বাহ্য জগতে মুক্ত পূর্ণ দিব্য ক্রিয়া চলিতে পারে ; কেন না আমাদের বর্ত্তমান কারণসমূহের দ্বারা সে ক্রিয়া অসম্ভব। সেই জন্যই তুমি অনুভব কর যে প্রাণময় গতিবৃত্তি প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য মানুষকে দিতে পারে, সেই শক্তিসামর্থ্যের দ্বারা সবকিছু সম্ভবপর হয় এবং তাহার সাহায্যে ভালমন্দ যে অনুভূতি তুমি চাও তাহা

তুমি পাইতে পার—সাধারণ অনুভূতি অথবা আধ্যাত্মিক জীবনের অনু-ভূতি—এবং সেই কারণেই যখন এই সামর্থ্য আসে তখন তুমি অনুভব কর যে জড়দেহে এবং দেহ-চেতনাতে একটা শক্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তারপর প্রাণসত্তাতে মায়ের সংস্পর্শ এবং তাহার ফলে একটা সুন্দর মহান্ অভিজ্ঞতার বোধ, তাহাও স্বাভাবিক ও যথাযথ ; কেন না সত্তার চৈত্যভূমি ও অপরাপর ভূমির মত প্রাণভূমিকেও মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করিতে হইবে, মায়ের কাছে পূর্ণভাবে সমর্পিত হইতে হইবে।

কিন্তু এ-কথা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই যে মানুষের প্রাণময় সত্তা ও জীবনীশক্তি দিব্য জ্যোতি হইতে বিচ্যুত, এবং বিচ্যুত বলিয়াই যে-কোন শক্তি, দীপ্ত বা অন্ধকার, দিব্য বা অদিব্য তাহাদিগকে ধরিতে পারে। সাধারণতঃ প্রাণশক্তি মানব-মন ও মানব-জীবনের সাধারণ অন্ধকার বা অর্দ্ধচেতন গতিবিধির কাজ করে—তাহার নিত্যকার কল্পনা-ধারণার, স্বার্থের, রাগানুরাগের, বাসনা-কামনার কাজ। কিন্তু প্রাণশক্তির পক্ষে তাহার সাধারণ সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করাও সম্ভব ; এইরূপে সীমা অতিক্রম করিলে ইহা নিজ শক্তির একটা এমন প্রেরণা, উত্তেজনা, তীব্রতা, উর্দ্ধায়ন লাভ করিত পারে, যাহার বলে ইহা ভাগবত শক্তির দেব শক্তির বা অসুর শক্তির যন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। অথবা স্বভাবের মধ্যে যদি একটা কেন্দ্রগত স্থির সংযম না থাকে, তাহা হইলে ইহার ক্রিয়া এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সংমিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, অথবা একবার এদিকে একবার ওদিকে দোলায়মান হইতে পারে। অতএব তোমার মধ্যে ক্রিয়মাণ একটা প্রচণ্ড প্রাণশক্তি থাকিলেই হইল না ; উচ্চতর চেতনার সহিত সেই শক্তির সংস্পর্শ থাকা আবশ্যক, তাহাকে

যথার্থ চালনার বশীভূত করা আবশ্যক, ভাগবত শাসনাধীন করা আবশ্যক। সেই কারণেই প্রাণশক্তির ক্রিয়া অনেক সময়ে অবজ্ঞার বা নিন্দার বস্তু হয়; কারণ তাহার মধ্যে প্রয়োজন মত জ্যোতি বা সংযম নাই এবং তাহা অজ্ঞান অদিব্য গতিবিধির সহিত সম্বদ্ধ। এইজন্যই উর্দ্ধতন প্রেরণা ও শক্তির কাছে তাহার আত্মোন্মীলন আবশ্যক। অনিয়ন্ত্রিত প্রাণশক্তি মানুষকে কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে পারে না, অনেক সময়ে উহা অনর্থক কষ্টকর ও ক্ষতিকর বৃত্তাকার পথে ঘোরে, এমন কি গভীর গহ্বরের মুখের কাছে মানুষকে লইয়া উপস্থিত করে; এই শক্তিকে উর্দ্ধতন চেতনার সহিত সংযুক্ত করিতেই হইবে, যে-দিব্যশক্তি একটা মহান জ্যোতির্ম্ময় উদ্দেশ্য লইয়া ইহার মধ্য দিয়া কাজ করিবে তাহার সহিত ইহাকে জুড়িয়া দিতেই হইবে।

এই যোগস্থাপনের জন্য দুইটি আবশ্যকীয় গতিধারা আছে। একটি হইল উর্দ্ধমুখী; প্রাণময় সত্তা উঠিয়া যায় উচচতর চেতনার সহিত সংযুক্ত হইতে, এবং সেইখানে উচচতর জ্যোতির ও উচচতর শক্তির প্রেরণাতে নিজেকে পরিপূরিত করিয়া লয়। অপর গতিটী হইল অধোমুখী; প্রাণময় সত্তা সাধারণ গতিবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া স্তব্ধ শান্ত শুদ্ধভাবে অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না উপর হইতে একটা সচল শক্তি তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে তাহার যথাথ সত্তাতে পরিবর্ত্তিত করে এবং তাহার গতিবৃত্তিকে, যেমন শক্তিতে তেমনই জ্ঞানে, পরিপূর্ণ করে। সেইজন্যই সাধক কখন কখন বোধ করে যেন সে একটা মহত্তর অধিকতর সুখময় চেতনাতে উঠিয়া যাইতেছে, একটা উজ্জ্বলতর প্রদেশে ও শুদ্ধতর অভিজ্ঞতাতে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু অপরপক্ষে

আবার সাধক কোন কোন সময়ে বোধ করে যেন তাহাকে প্রাণভূমিতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে সাধনা করিতে হইবে এবং সেই ভূমিতে ধ্রুব চেতনাকে নামাইয়া আনিতে হইবে। এই দুই গতিধারার মধ্যে কোন যথার্থ অসঙ্গতি নাই ; তাহারা পরস্পরের পূরক, পরস্পরের কাছে অপরিহার্য্য—ঊর্দ্ধগতি দিব্য অবতরণের সহায়তা করিতেছে, এবং অধোগতি সার্থক করিতেছে সেই বস্তুকে যাহা ঊর্দ্ধগমনের লক্ষ্য এবং যাহা ঊর্দ্ধগমনকে একান্ত প্রয়োজনীয় করিতেছে।

যখন তুমি তোমার প্রাণসত্তার সহিত নিম্নতর প্রাণভূমি হইতে উপরে উত্থিত হও এবং তাহাকে চৈত্যসত্তার সহিত সংযুক্ত কর, তখন তোমার প্রাণসত্তা ভরিয়া উঠে সেই শুদ্ধ আস্পৃহা ও ভক্তিতে যাহা চৈত্যপুরুষের স্বাভাবিক গুণ ; সেই সঙ্গে উহা তোমার আবেগরাজিকে প্রচুর সামর্থ্য আনিয়া দেয়, তাহাদিগকে সক্রিয় করিয়া তোলে, জড়তম অবধি তোমার সমগ্র প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিবার জন্য এবং পার্থিব জড় উপাদানের মধ্যে দিব্য চেতনাকে নামাইয়া আনিবার জন্য। যখন তোমার প্রাণময় শুধু চৈত্যসত্তাকে স্পর্শ না করিয়া উচ্চতর মনের সহিতও গলিয়া এক হইয়া যায়, তখন সে একটা শ্রেষ্ঠতর দীপ্তি ও জ্ঞানের সংস্পর্শে আসিতে পারে এবং সেই দীপ্তি ও জ্ঞানের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে পারে। সাধারণতঃ প্রাণসত্তা মানুষের মনের দ্বারা চালিত হয় এবং মনের অল্পবিস্তর অজ্ঞান আদেশাবলীর দ্বারা শাসিত হয়, অথবা এমনও হয় যে প্রাণতত্ত্ব বলপূর্ব্বক মনকে ধরে এবং তাহাকে আপন রাগ আবেগ কামনার তুষ্টির নিমিত্ত ব্যবহার করে। অথবা সে এই দুই গতিকে মিশাইয়া ফেলে ; কেন না সাধারণ মানব-মন এতটা অজ্ঞান যে তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠতর ক্রিয়া কি

পূর্ণতর চালনা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যখন প্রাণ উচ্চতর মনের সংস্পর্শে আসে, তখন তাহা চালিত হইতে পারে একটা মহত্তর জ্যোতি ও জ্ঞানের দ্বারা, একটা উচ্চতর বোধি ও প্রেরণার দ্বারা, একটা ধ্রুবতর বিচারণার দ্বারা এবং দিব্য সত্য ও দিব্য ইচ্ছার কতক কতক আত্মপ্রকাশের দ্বারা। প্রাণসত্তার এই চৈত্যপুরুষের ও উচ্চতর মনের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, ইহাই হইল যৌগিক চেতনার জীবনের উপর সচল ক্রিয়ার জন্য বহিঃপ্রকাশের আরম্ভ।

কিন্তু ইহাও দিব্য জীবনের নিমিত্ত যথেষ্ট নয়। উচ্চতর মানস-চেতনার সংস্পর্শে আসা একটা অপরিহার্য্য মধ্যবর্ত্তী স্তর মাত্র, ইহা কোনক্রমেই পর্য্যাপ্ত নয়। যাহা একান্ত আবশ্যক তাহা হইল আরও উচ্চ ও শক্তিমান ভূমিচয় হইতে দিব্যশক্তির অবতরণ। উচ্চতর চেতনার অতিমানস শক্তি ও জ্যোতিতে রূপান্তর, প্রাণের ও জীবনী-শক্তির পরিণতি দিব্য সামর্থ্যের শুদ্ধ, শান্ত, উদার, তীব্র ও শক্তিমান যন্ত্ররূপে, ভৌতিক দেহের অবধি সত্তান্তর দিব্য জ্যোতি, দিব্য সামর্থ্য, দিব্য ক্রিয়া, দিব্য সুষমা ও আনন্দে—এসব অসম্ভব এখনও অদৃশ্য শিখররাজি হইতে এই দিব্যশক্তির অবতরণ ব্যতিরেকে। সেই জন্যই আমাদের যোগে ভাগবত তত্ত্বে উত্তরণ করিলেই সব কাজ হইল না (সকল যোগমার্গেই এই উত্তরণ উদ্দিষ্ট), আমাদের সাধনাতে ভগবানকে ইহলোকে নামাইয়া আনিতেও হইবে মন-প্রাণ-দেহের সমস্ত শক্তিকে রূপান্তরিত করিবার নিমিত্ত।

২৮-১১-২৯

পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবিদ্যা ও প্রাচ্য যোগ

ইউরোপের আধ্যাত্মিক চিন্তা—যে ভাবুকগণ ঈশ্বরের বা কেবল ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং স্বরূপ প্রমাণ করিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের চিন্তাও—আপন পদ্ধতি ও পরিণামে বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া যায় না। কিন্তু পরম সত্যকে বুঝিবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই; বুদ্ধি কেবল সেই সত্যের সন্ধানে ঘুরিতে ফিরিতে পারে, তাহার টুকরা টুকরা প্রতি-চ্ছবি সংগ্রহ করিতে, সমগ্রটী নয়, এবং সেই সমস্ত টুকরাকে জুড়িবার চেষ্টা করিতে পারে। মানব-মন পরম সত্যে পৌঁছিতে পারে না; সে পারে শুধু একটি বা বহু খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি গড়িতে সত্যের প্রতিরূপ বলিয়া। ইউরোপীয় চিন্তাধারার অপর প্রান্তে তাই সর্ব্বদা আসিতেই হইবে অজ্ঞেয়বাদ, প্রকট বা প্রচ্ছন্ন। বুদ্ধি যদি সরলভাবে তাহার আপন দৌড়ের শেষ পর্য্যন্ত যায় ত ফিরিয়া আসিয়া বলিবে, "আমি জানিতে পারিতেছি না; আমার বোধ হয় যে পরপারে একটা কিছু, একটা চরম সত্য থাকিতে পারে, কিংবা হয়ত থাকিতে বাধ্য, কিন্তু তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমি কেবল অনুমান করিতে পারি; তাহা হয় একটা অজ্ঞেয় তত্ত্ব, নয়ত তাহাকে জানা আমার সাধ্যাতীত।" অথবা যদি বুদ্ধি যাইতে আসিতে পথে কিছু আলো পাইয়া থাকে, সুদূর হইতে আগত, তাহা হইলে সে এরূপও বলিতে পারে, "হয়ত মনের সীমার বাহিরে একটা চেতনা আছে, কেন না আমি মাঝে মাঝে নিমেষের জন্য তাহার কিছু দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার নিকট হইতে নির্দ্দেশও

পাইয়াছি। যদি পরস্তাৎ-এর সহিত তাহার সংস্পর্শ থাকে অথবা যদি তাহাই পরপারের চেতনা হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তুকে জানা যাইতে পারে, অন্যথা নয়।"

শুধু বুদ্ধি দ্বারা পরম সত্যের অনুসন্ধান করিলে তাহার পরিণাম হইবে হয় এইরূপ অজ্ঞেয়বাদ, নয় কোন বুদ্ধিগত ধারা, নয়ত কোন মনগড়া সূত্র বা বিধান। এইরূপ শত শত ধারা ও সূত্র হইয়া গিয়াছে, আরও শত শত হইতে পারে, কিন্তু কোনটীই যথার্থ পথ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। মনের কাছে তাহার প্রত্যেকটীর মূল্য থাকিতে পারে; বিভিন্ন ধারার পরস্পর-বিরোধী মতবাদসমূহ সমান শক্তিসম্পন্ন সমান বোধসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধির কাছে গ্রহণীয় হইতে পারে। এই সমস্ত আন্দাজ অনুমান করিবার শ্রমের একটা সার্থকতাও আছে, কেন না ইহাতে মনের শিক্ষা হয় এবং (মনের সম্মুখে সর্ব্বদা থাকে একটা পরপারের তত্ত্ব, একটা চরম কিছু যাহার দিকে মনকে ফিরিতেই হইবে। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারে শুধু অস্পষ্টভাবে, তাহার দিকে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার পার্থিব অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আংশিক ও পরস্পর-বিরোধী নির্দ্দেশ করিতে পারে মাত্র; যুক্তিবুদ্ধি তাহার মধ্যে প্রবেশও করিতে পারে না, তাহাকে জানিতেও পারে না) যতদিন আমরা শুধু বুদ্ধির রাজ্যে বাস করিতেছি, ততদিন আমরা এইটুকু মাত্র করিতে পারি—যাহা ভাবিয়াছি খুঁজিয়াছি, তাহার গবেষণা নিরপেক্ষভাবে করিতে পারি, অবিরাম নূতন নূতন কল্পনা-ধারণাকে (যত রকম কল্পনা-ধারণা সম্ভবপর) এবং নানা প্রকার দার্শনিক বিশ্বাস মতবাদ ও সিদ্ধান্তকে মনে স্থান দিতে পারি।

একটা উদার নমনীয় বুদ্ধির পক্ষে এইরূপ নিঃস্বার্থ সত্যান্বেষণই হইবে একমাত্র সম্ভবপর মূলভাব। কিন্তু এইভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেও তাহা আনুমানিক হইবে মাত্র ; তাহার কোন আধ্যাত্মিক মূল্য থাকিতে পারে না ; আত্মা যে ধ্রুব অভিজ্ঞতা বা আধ্যাত্মিক নিশ্চয় খুঁজিতেছে, এই মানস সিদ্ধান্তও তাহা দিতে পারিবে না। যদি বুদ্ধিই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র হয়, যদি অতিভৌতিক সত্যে পৌঁছিবার আর কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে একটা বুদ্ধিসঙ্গত উদার অজ্ঞেয়-বাদই আমাদের চরম ভাব হইতে বাধ্য। সৃষ্টিগত বস্তুরাজিকে কতক-দূর জানা যাইতে পারে, কিন্তু পরম তত্ত্ব এবং মনের অতীত সবকিছু আমাদের কাছে চিরদিন অজ্ঞেয় থাকিবেই।

(শুধু যদি মনের পরস্তাৎ একটা শ্রেষ্ঠতর চেতনা থাকে আর সেই চেতনা আমাদের প্রাপ্তব্য হয়, তবেই আমরা চরম সত্যকে জানিতে পারি, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি) একটা মহত্তর চেতনা আছে কি নাই এ সম্বন্ধে বুদ্ধির অনুমান কি ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি আমাদিগকে বহুদূর লইয়া যাইতে পারে না। আমাদের যাহা আবশ্যক তাহা হইল এই চেতনার অনুভূতি লাভের, এই চেতনাতে উপনীত হইবার, ইহাতে প্রবেশ করিবার, ইহাতে বাস করিবার উপায়। ইহা যদি আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে বুদ্ধির যুক্তি ও অনুমান আপন হইতেই গৌণ বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে, আর তাহার কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। দশন শাস্ত্র ও পরম সত্যের বুদ্ধিগত অভিব্যক্তি থাকিতে পারে কিন্তু প্রধানতঃ এই মহত্তর আবিষ্কারকে এবং তাহার উপাদান সমূহের যতটা মনের ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব ততটাকে, প্রকাশ করিবার নিমিত্ত

সেইসব লোকের জন্য যাহারা এখনও মনোবুদ্ধিতে বাস করিতেছে।

ব্রাডলী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাবুকদের কথা তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর তুমি পাইলে, দেখিতেছ ত—যে ভাবুকগণ "চিন্তার অতীত সেই অপর তত্ত্বের" ধারণাতে বুদ্ধিগত চিন্তার দ্বারা পৌঁছিয়াছেন, অথবা ব্রাডলীর মত আপন সিদ্ধান্তরাজিকে এমন ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যাহা "আর্য্য" পত্রিকার ভাষা মনে করাইয়া দেয়। এই ধারণা ত নূতন নয়, ইহা বেদের মতই পুরাতন। নানা বিভিন্ন রূপে ইহা বার বার ব্যক্ত হইয়াছিল, বৌদ্ধদর্শনে, সুফীদর্শনে, খৃষ্টীয় সূক্ষ্ম অতিমানস অনুভূতিতে। মূলতঃ (বুদ্ধির অনুমানের দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত হয় নাই, হইয়াছিল আন্তর আধ্যাত্মিক সাধনা রত সাধকদিগের দ্বারা) যখন খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম হইতে পঞ্চম শতাব্দী আন্দাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জনগণ জ্ঞানকে বুদ্ধিগত করিয়া লইতে আরম্ভ করিল, তখন এই দিব্য সত্য প্রাচ্যদেশে বাঁচিয়া রহিল : পাশ্চাত্যে, যেখানে মানুষ বুদ্ধিকে সত্যানুসন্ধানের একমাত্র বা প্রধান যন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল সেখানে এই সত্য লোপ পাইতে বসিল। কিন্তু সেখানেও ইহা বার বার ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিয়াছে ; নব্য-প্লাতনীয়গণ ইহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, এবং এখন আবার মনে হইতেছে যে নব্য হেগেলীয়গণ ও অন্যান্য দার্শনিকেরা (যথা রুষদেশীয় উস্পেন্স্কী এবং আমার মতে, দুই একজন জার্ম্মান মনীষী) বোধ হয় যেন এই সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তথাপি একটা প্রভেদ আছে। প্রাচীতে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, অতিভৌতিক ভাবুকেরা, পাশ্চাত্যের

মতই, চেষ্টা করিয়াছেন বুদ্ধিদ্বারা উচ্চতম সত্যের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে। কিন্তু তাঁহারা মনের বিচারকে মুখ্য স্থান দেন নাই, গৌণ স্থানই দিয়াছেন, সত্যাবিষ্কারের উপায় বলিয়া। প্রথম স্থান সর্ব্বদাই দেওয়া হইয়াছে আধ্যাত্মিক বোধি ও দীপ্তিকে এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ; বুদ্ধির যে সিদ্ধান্ত এই শ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশের সহিত অসমঞ্জস তাহাকে অগ্রাহ্য বলিয়া লওয়া হইয়াছে। তারপর প্রত্যেক দার্শনিক ধারা শ্রেষ্ঠতম চেতনাতে পৌঁছিবার একটা কার্য্যকরী উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছে, যাহার ফলে মানুষ চিন্তা লইয়া আরম্ভ করিলেও তাহার লক্ষ্য থাকে যে মানস চিন্তার অতীত চেতনায় পৌঁছিবে। (প্রত্যেক দার্শনিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা (এবং তাঁহার অনুগামী ও পরবর্ত্তীগণ) একাধারে সূক্ষ্মতত্ত্বের ভাবুকও বটেন, যোগীও বটেন। যাহারা শুধু বুদ্ধিজীবী দার্শনিক তাঁহাদিগকে লোকে বিদ্বান বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে কিন্তু তাঁহারা সত্যের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া পরিগণিত হন নাই।) আর, যে-সমস্ত দার্শনিক ধারার পশ্চাতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা শক্তিমান প্রণালী ছিল না সেগুলি বেশীদিন টিকে নাই, কেন না তাহারা আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ও উপলব্ধির সচল পন্থা ছিল না।

পাশ্চাত্যে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটিল। ভাবনা, বুদ্ধি, ন্যায়-সম্মত যুক্তি, এই সমস্তকে লোকে উচ্চতম করণ, এমন কি, উচ্চতম লক্ষ্য, বলিয়া নিত্য বেশী মনে করিতে থাকিল ; দর্শনশাস্ত্রে ভাবনাই সব, ভাবনাই আদি-অন্ত। বুদ্ধিসঙ্গত চিন্তা ও অনুমানের দ্বারাই সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক অনুভূতিকেও বুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য ডাক দেওয়া হইয়াছে—নহিলে তাহা

গ্রহণীয় হইবে না ; ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ঠিক বিপরীত। যাহারা বোঝে যে মানস চিন্তাকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং অতিমানস তত্ত্বকে মানিয়া লয়, তাহারাও এই ভাব ছাড়িতে পারে না যে মানস চিন্তার মধ্য দিয়া সেই চিন্তার উর্দ্ধায়ন ও রূপান্তরের দ্বারাই উর্দ্ধতন দিব্য সত্যকে প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং সেই সত্যকে মনের সসীমতা ও অজ্ঞানের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর এক কথা, পাশ্চাত্য চিন্তা আর সক্রিয় নাই ; উহা বস্তুরাজি সম্বন্ধে মতবাদের অনুসরণ করে উপলব্ধির নয়। প্রাচীন গ্রীসীয়দের সময়ে চিন্তা সক্রিয় ছিল, যদিচ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে ততটা নয়, যতটা স্থনীতি ও সুষমার দিকে। পরবর্ত্তীকালে ইহা আরও বেশী শুদ্ধ বুদ্ধিগত ও বিদ্যার্জন সংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল ; শুধু বুদ্ধিগত গবেষণা হইয়া পড়িল যাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক পরীক্ষা-প্রয়োগ, আধ্যাত্মিক আবিষ্কার, একটা আধ্যাত্মিক রূপান্তরের দ্বারা দিব্য সত্য লাভের কোন উপায় বা পন্থা রহিল না। এই প্রভেদ যদি না থাকিত, তাহা হইলে তোমার মত সাধকের চালনার জন্য প্রাচীর দিকে ফিরিবার কোন কারণ থাকিত না ; কেন না শুদ্ধ বুদ্ধির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবুক ও প্রাচ্য ঋষি সমতুল। (ইউরোপের মন অতিবুদ্ধির ফলে যাহা হারাইয়াছে তাহা হইল আধ্যাত্মিক পথ, যে পথ বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যায়, যাহা বাহ্য সত্তা হইতে অন্তরতম আত্মার মধ্যে প্রবেশের মার্গ।)

ব্রাড়লী ও জোয়াচিমের লেখা হইতে তুমি যাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়াছ, তাহাতেও ঐ মানুষী বুদ্ধিই বুদ্ধির অতীত বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে, এবং তাহার বিষয়ে বুদ্ধিগত যুক্তিযুক্ত আনুমানিক সিদ্ধান্তে

উপনীত হইতে পারে। যে-রূপান্তর ইহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার নিমিত্ত ইহা ক্রিয়াশীল নয়। যদি এমন হইত যে এই লেখকদ্বয় কোন উপলব্ধিকে (এমন কি, মানস উপলব্ধিও), এই "চিন্তাতীত অপর বস্তুর" বোধিমূলক কোন অভিজ্ঞতাকে, মনের ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন, তাহা হইলে যে-মানুষ প্রস্তুত আছে সে মানস ভাষার আবরণের মধ্য দিয়া সেই বস্তুকে অনুভব করিবে, এবং সেই উপলব্ধি নিকটস্থ হইবে। অথবা যদি তাঁহারা বুদ্ধিগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরে, একটা পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া বা কোন পুরানো পথ অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে যাইয়া পৌঁছিতেন, তাহা হইলে অপর ব্যক্তি তাঁহাদের চিন্তা ধারাকে অনুসরণ করিয়া নিজেকে সেই উপলব্ধির জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু এই শ্রমসাধ্য চিন্তার পথে সেরূপ কিছু ত হয় না! চিন্তা বুদ্ধিরাজ্যেই থাকে এবং সে-রাজ্যে অতি উত্তম কাজই করে; কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য ক্রিয়াশীল হয় না।

মানুষ যে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে যাইবে (যে-জ্ঞানের দ্বারা সে যাহা জানে তাহা সে হইতে পারে), তাহা সমগ্র সত্যের মানস আলোচনা দ্বারা নয়, চেতনার রূপান্তরের দ্বারা। বাহ্য চেতনা হইতে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ চেতনাতে প্রবেশ করা; চেতনাকে দেহের ও অহমিকার সীমার বাহিরে প্রসারিত করা; একটা আন্তর সঙ্কল্প ও অভীপ্সার বলে চেতনাকে উন্নত করা, তাহাকে দিব্য জ্যোতির দিকে উন্মীলিত করা যতদিন না তাহা মনের ঊর্দ্ধে উন্নীত হয়; আত্মনিবেদন ও আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়া অতিমানস দিব্যতত্ত্বকে নামাইয়া আনা এবং তাহার

ফলে মনপ্রাণদেহের রূপান্তর সাধিত করা—এই হইল পরম সত্যের* পানে যাইবার পূর্ণতম পন্থা। আমরা এখানে ইহাকেই সত্য বলি, ইহাই আমাদের যোগের লক্ষ্য।)

১৫-৩-৩০

* আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অতিমানসের কল্পনা প্রাচীনকাল অবধি আছে। ভারতে তথা অন্যত্র মানুষ ইহার পানে উঠিয়া গিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এই উপায় অনুসরণ করিয়া মানুষ ইহাকে জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ করিতে পারে নাই, সমগ্র স্বভাবের, জড়প্রকৃতির অবধি, রূপান্তর সাধনের জন্য ইহাকে নামাইয়া আনিতে পারে নাই।

পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদী ও বৈদান্তিক অজ্ঞেয় তত্ত্ব

যে-মানুষ আধ্যাত্মিকের ঠিক বিপরীত দিক হইতে নজর করিতে আরম্ভ করে, (বিক্টোরীয় অজ্ঞেয়বাদীর দৃষ্টিধারা এইরূপই ছিল) তাহাদের মত ফেরান সম্ভব নয়, যতই বোঝান যাক না কেন। যোগানুভূতির মূল্য সম্বন্ধে তাহার সংশয় (অন্তর্মুখী ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া) হইল এই যে উহার লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সত্য নয় এবং উহা চরম সত্যে লইয়া যাইবে এরূপ বলা যায় না এইজন্য যে এইসকল অনুভূতি সাধকের ব্যক্তিত্বের রঙে রঞ্জিত। আমরা একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে পদার্থবিদ্যাই কি কোন চরম সত্যে উপনীত হইয়াছে। বরং বলা যায় যে জড়ভূমিতেও এই বিজ্ঞান যত অগ্রসর হয়, চরম সত্য তত পিছাইয়া যায়। বিজ্ঞান আরম্ভেই এই কথা ধরিয়া লইয়াছিল যে চরম সত্য ভৌতিক ও বহির্মুখী হইতে বাধ্য—এবং বহির্মুখী চরম বস্তুই (কিংবা তদপেক্ষা কম কিছু) সমস্ত অন্তর্মুখী ঘটনাবলীর রহস্যভেদ করিবে। যোগ আরম্ভ করে ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যে চরম সত্য আধ্যাত্মিক ও অন্তর্মুখী, এবং সেই চরম দীপ্তিতেই বাহ্য ঘটনাবলীকে দেখিতে হইবে। এই হইল দুই বিপরীত প্রান্ত, এবং ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক বিশাল গহ্বর।

তবে যোগও এতদূর বৈজ্ঞানিক ব্যাপার যে ইহা আন্তর পরীক্ষা-প্রয়োগের সাহায্যে অগ্রসর হয় এবং তাহার সমস্ত সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে সাক্ষাৎ অনুভূতির ভিত্তির উপর ; মানস বোধিকে উহা গ্রহণ

করে আরম্ভের পদক্ষেপ বলিয়া, তাহাকে উপলব্ধি বলিয়া মানে না—যোগের মতে সম্বোধি সমর্থিত হওয়া চাই সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা,রূপান্তরিত হওয়া চাই অনুভূতিতে। ভৌতিক মন এই অনুভূতির মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান, এইজন্য যে তাহা অন্তর্মুখী, বহির্মুখী নয়। কিন্তু এই প্রভেদের কোন মূল্য আছে কি ? সকল জ্ঞান, সকল অনুভূতিই কি মূলতঃ অন্তর্মুখী নয় ? মানুষ বাহ্য বস্তুরাজিকে একই প্রকার দৃষ্টিতে দেখে তাহার মন ও ইন্দ্রিয়বোধের গঠনের জন্য। যদি গঠন অন্যপ্রকার হইত, তাহা হইলে জড়জগৎও বর্ণিত হইত বিভিন্নরূপে—বিজ্ঞানই একথা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। তবে তোমার বন্ধুর বক্তব্য হইল যে যোগের অনুভূতি ব্যক্তিগত, সাধকের আপন ব্যক্তিত্বের রঙে রঞ্জিত। একথা কতকটা সত্য হইতে পারে কোন কোন বিশিষ্ট ভূমিতে অনুভূতিকে যে বিশিষ্ট রূপ বা মূর্ত্তি দেওয়া হয় তাহাব সম্বন্ধে ; কিন্তু সেখানেও পার্থক্য বহিস্তলের। বস্তুতঃ যৌগিক অনুভূতিরাজি সর্ব্বত্র একই সূত্ররাজি ধরিয়া চলে। তবে সত্য বলিতে সূত্র ত একটা নয়, অনেক ; কেননা একথা নিশ্চিত যে আমাদের সম্বন্ধ এমন এক বহুমুখী অসীমের সহিত, যাহার কাছে যাইবার বহু পথ আছে, থাকিতেই হইবে ; তথাপি প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি সর্ব্বত্র এক, এবং সম্বোধি, অনুভূতিরাজি ও ঘটনাচয় বহু দূরে দূরে অবস্থিত দেশ ও যুগে, সম্পূর্ণ পৃথক সব সাধনা ধারাতে এক ও অভিন্ন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় ভক্ত সাধকের অনুভূতিচয় ও মধ্যযুগের ভারতীয় ভক্তসাধকের অনুভূতিচয় বস্তুতঃ একেবারে অভিন্ন—ভেদ যেটুকু, তাহা নামে ও রূপে ও ধর্ম্মের রঙে ; তথাপি ইঁহারা পরস্পরের সাধনার অনুভূতি ও ফলাফল সম্বন্ধে কিছু জানিতেন

না—তাঁহাদের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না, যেমন আজিকার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে থাকে, তাঁহারা যে-দেশেরই হোন না কেন। ইহা হইতে মনে হয় যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একটা কিছু আছে যাহা অভিন্ন এক, সর্ব্বত্র প্রযুজ্য এবং ধ্রুব সত্য—তাহার মানসিক অনুবাদের মধ্যে যতই কেন বর্ণ-বৈচিত্র্য থাকুক ভাষাভেদের জন্য।

চরম সত্য সম্বন্ধে বিক্টোরীয় যুগের অজ্ঞেয়বাদী ও ভারতীয় বৈদান্তিক, দুজনেই, বোধ হয়, একমত হইবেন যে তাহা আছে বটে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে। দুজনেই উহাকে অজ্ঞেয় বলেন; তবে প্রভেদ এই যে বেদান্তিনের মতে ইহা মনের দ্বারা অজ্ঞেয়, বাক্যের দ্বারা অবর্ণনীয়, হইলেও মানস প্রত্যক্ষ অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর কিছুর দ্বারা অধিগম্য, এমন কি, মনও ভাবনায় ধরিতে পারে, বাক্যও ব্যক্ত করিতে পারে সেই সত্যের সহস্র ভাবকে, যাহা মনের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী অনুভূতির সম্মুখে উপস্থিত হয়। বিক্টোরীয় অজ্ঞেয়বাদী হয়ত মন ও তদপেক্ষা উচ্চতর বৃত্তির মধ্যে এই প্রভেদ করিবেন না; তিনি অজ্ঞেয় তত্ত্বের অস্তিত্বকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন, আর, অস্তিত্ব মানিলেও বলিবেন যে তাহাকে জানা যায় না কোন প্রকারেই।

১০-১০-৩২

সন্দেহ-সংশয় ও ভগবান

সারা জগৎ জানে, আধ্যাত্মিক ভাবুক ও জড়বাদী উভয়েই, যে প্রকৃতির অজ্ঞানের বা নিশ্চেতনার পরিবেশের মধ্যে সৃষ্ট, বা স্বভাবের গতিতে বিকশিত, জীবের কাছে এই জগৎ পুষ্পশয্যাও নয়, আনন্দোজ্জ্বল পথও নয়। এ একটা দুরূহ পথযাত্রা, একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি, একটা যুদ্ধ, অনেক সময়ে একটা কষ্টকর ও ব্যাহত অগ্রগতি, অন্ধকার অসত্য ও বেদনার দ্বারা বেষ্টিত জীবন। ইহার আপন মনোময় প্রাণময় দেহময় হর্ষসুখাদি আছে, কিন্তু ইহারা অতি অল্পকালস্থায়ী সুস্বাদ আনিয়া দেয়---তবু প্রাণসত্তা তাহা ছাড়িতে চায় না—তাহাদের পরিণাম বিস্বাদ, শ্রান্তি বা মোহভঙ্গ। তার পর কি? ভগবান নাই, একথা বলা সহজ, কিন্তু সে-অস্বীকৃতি ত মানুষকে কোথাও লইয়া যাইতে পারে না--ঠিক যেখানে ছিলে সেইখানেই বসিয়া থাক, অবস্থা ভাল হইবার কোন পথ দেখা যায় না—রাসেল কিম্বা অপর কোন জড়বাদী তোমাকে ত বলিতে পারে না তুমি কোন্ দিকে যাইতেছ বা কোন্ দিকে তোমার যাওয়া উচিত। (একথা স্বীকার করা যায় যে ভগবান বাহ্য পার্থিব ক্রিয়াবলীর মধ্যে এমনভাবে আপনাকে প্রকট করেন না যে তাঁহাকে চেনা যায়।) এই ক্রিয়ারাজি কোথাকারও কোন স্বেচ্ছাচারী একচ্ছত্রী রাজশক্তির কাজ নয়---ইহারা হইল ইহজীবনের একটা বিশিষ্ট স্বভাব-অনুযায়ী শক্তির খেলার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী, এমনও বলা যাইতে পারে যে ইহারা সত্তার একটা বিশিষ্ট ধারা বা সমস্যার আনুষঙ্গিক, যে-ধারার মধ্যে আমরা সবাই প্রবেশ

করিতে, কাজ করিতে রাজী হইয়াছি। কাজ দুঃখজনক, সংশয়াত্মক, তাহার ফলে কি বিপদ-আপদ আসিবে বলা যায় না! (এই জীবনের পরিণতি দুইপ্রকার হইতে পারে—হয় বৌদ্ধ কি মায়াবাদীর নির্দ্দেশানুসারে প্রপঞ্চের মধ্য হইতে বাহির হইয়া নির্ব্বাণে প্রবেশ, নয়ত, নিজের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেখানে ভগবানকে আবিষ্কার করা, যেহেতু বাহিরে ত তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা এই চেষ্টা করিয়াছে, এমন শত শত সহস্র সহস্র লোক হইয়া গিয়াছে, তাহারা যুগ যুগান্ত ধরিয়া সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে যে ভগবান সর্ব্বভূতের অন্তরে রহিয়াছেন—সেইজন্যই যোগসাধনা। তাঁহাকে পাইতে কি দীর্ঘকাল লাগে? ভগবান তাঁহার আপন মায়ার ঘন আবরণের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বা অবিলম্বে আমাদের ডাকে সাড়া দেন না। অথবা তিনি ক্ষণিক একটা অস্পষ্ট দর্শন দিয়া সরিয়া যান এবং আমাদের প্রস্তুত হইবার জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু যদি ভগবানের কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে আমরা কি কষ্ট করিয়া, কালক্ষেপ করিয়া, শ্রমস্বীকার করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিব, না বিনা শিক্ষায়, বিনা স্বার্থত্যাগে, বিনা আয়াসে, বিনা দুঃখভোগে তাঁহাকে পাইবার জন্য জোর করিব? এরূপ দাবী করা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়। একথা ধ্রুব যে আমাদিগকে ভিতরে আবরণের পশ্চাতে যাইতেই হইবে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য; এইরূপ করিলে তবে আমরা তাঁহাকে বাহিরে দেখিতে পাইব এবং আমাদের বুদ্ধি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার সান্নিধ্য মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে, তাহার বিশ্বাস হোক বা না হোক—যেমন কোন মানুষ একটা বস্তুকে অস্বীকার করার পরে সেই বস্তুকে দেখিলে

আর অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সে-নিমিত্ত যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সংকল্পে দৃঢ়তা ও প্রয়াসে ধৈর্য্য লইয়া আসিতে হইবে।

১০-৯-৩৩

নিম্নভূমির অলীক আলো

এখানে দিব্য সত্যের সাক্ষাৎ উৎসরাজি হইতে প্রবহমান একটা স্রোত অনুভব করা যাইতেছে, যে-সত্যকে মানুষ ইচ্ছামত দেখিতে পায় না। এখানে আছে একটা মনোবৃত্তি যাহা শুধু ভাবিতে পারে এরূপ নয়, দেখিতেও পারে—বস্তুরাজির শুধু বহিস্তল নয়, তাহাদের অন্তর অবধি দেখিতে পায়; বুদ্ধিগত চিন্তা নিরন্তর নিষ্ফল মল্লযুদ্ধ করিতেছে এই বহিস্তলের সহিত, যেন আর কিছু নাই। তান্ত্রিকেরা বাক্‌শক্তির একটা স্তরকে বর্ণনা করেন "পশ্যন্তী বাক্",অর্থাৎ যে-বাক্য দেখিতে পায়; এখানে রহিয়াছে "পশ্যন্তি বুদ্ধি", অর্থাৎ যে-বুদ্ধি দেখিতে পায়। এরূপ হইতে পারে এইজন্য যে আন্তর দ্রষ্টা চিন্তাকে অতিক্রম করিয়া অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এমন অনেকে আছে যাহাদের অনুভূতির প্রভূত ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-দৃষ্টি এতটা পরিষ্কার হয় নাই; আত্মা অনুভব করিতেছে বটে, কিন্তু মন তাহার মিশ্র ও অপূর্ণ প্রতিলিপি সব করিয়া যাইতেছে, ধারণাতে অস্পষ্টতা ও গণ্ডগোল সমস্ত ঘটিতেছে। এই লোকটির প্রকৃতিতে যথাযথ দৃষ্টির শক্তি নিশ্চয়ই প্রস্তুত হইয়াছিল।

এমন দ্রুত ও পূর্ণভাবে মেঘ-কুয়াসার ঝিকিমিকি আলোককে দূর করা কঠিন কাজ—যে মেঘ-কুয়াসাকে আজিকার বুদ্ধিবাদ পরম সত্যের দীপ্তি বলিয়া ভ্রম করে। আধুনিক মন নিম্নভূমির ঝুটো আলোকে এতদিন ধরিয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে (আর আমরাও সেইসঙ্গে

ঘুরিয়াছি) যে, আজ কাহারও পক্ষে সহজ নয় সূক্ষ্মদৃষ্টির সূর্য্যালোকের দ্বারা কুজ্ঝটিকারাজিকে অপসারিত করা এত শীঘ্র ও এমন সম্পূর্ণভাবে যেরূপ এখানে করা হইয়াছে। আধুনিক মানব-ধর্ম্ম ও দয়াদাক্ষিণ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আবেগময় আদর্শবাদীর ও অক্ষম বুদ্ধিবাদীর নিষ্ফল প্রয়াস সম্বন্ধে তথা ধর্ম্মমতের সমন্বয় ও সেইরূপ অন্যান্য প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সে সমস্তই সুচিন্তিত কথা, তাহাতে অবান্তর কিছু নাই। কিন্তু এসব উপায়ে ত মানুষের জীবনধারার একান্ত আবশ্যকীয় রূপান্তর সাধন সম্ভবপর হইবে না—তাহা হইতে পারিবে শুধু মূল সত্যে পৌঁছিলে, আন্তর ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন করিলে এবং চেতনাকে দিব্য রূপ দিলে। কিন্তু আজিকার চীৎকার গণ্ডগোল ও বিপর্য্যয়ের মাঝে সত্যের বাণী কাহাকেও শোনান কঠিন।

বহির্মুখী প্রকৃতির ঘটনাবলীর ক্ষেত্র এবং ভাগবত সত্যের ক্ষেত্র, এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা আন্তর জ্ঞানের মূল কথার অন্তর্গত, এই পার্থক্যের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে এখানে। ইহাকে পত্রলেখক যে-ভাবে দেখিয়াছেন, তাহা শুধু একজন টিকাকারের চাতুর্য্যের পরিচয় দেয় না, বরং তাহাকে বলা যায় একটা সুস্পষ্ট ধ্রুবতত্ত্বের অভিব্যক্তি, যে-তত্ত্ব তোমার দৃষ্টিপথে পড়ে যখন তুমি সীমারেখা পার হইয়া গিয়া বাহ্য জগৎকে দেখ তোমার আন্তর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে। তুমি যতই উর্দ্ধে উঠিবে বা যতই ভিতরে প্রবেশ করিবে, ততই তোমার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইবে এবং পদার্থবিজ্ঞানের দ্বারা ব্যবস্থিত তোমার বাহ্য জ্ঞান তাহার আপন যথার্থ ও একান্ত সীমাবদ্ধ স্থান গ্রহণ করিবে। অধিকাংশ মানসিক ও বহির্মুখী বিদ্যার মত পদার্থবিদ্যাও তোমাকে দেয়

শুধু পদ্ধতিপ্রণালীর তত্ত্ব। একথাও বলিতে পারি যে পদ্ধতিপ্রণালীর সমগ্র তত্ত্বও ইহা দিতে পারে না ; কারণ তুমি স্থূল ভারবান তত্ত্ব কিছু কিছু ধরিতে পারিলেও অত্যাবশ্যকীয় সূক্ষ্ম ভারহীন তত্ত্বরাজি তোমার নজরের বাহিরে থাকিয়া যায় ; তুমি ধরিতে পার কেবল ঘটনাবলীর পরি-বেশ, কিন্তু কি প্রকারে তাহারা ঘটিতেছে তাহা একরকম অজানা থাকিয়া যায়। পদার্থবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ, তাহার জয়জয়কার সত্ত্বেও সমগ্র জাগতিক ব্যাপারের মূলতত্ত্ব, তাহার কারণ, তাহার অর্থ, আগের মতই, হয়ত বা আগের চেয়েও বেশী, অন্ধকার ও রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান ক্রমবিকাশের যে ছক প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে তাহা একটা অযৌ-ক্তিক জাদুবিশেষ, অতিবড় রহস্যময় কল্পনা অপেক্ষাও বুদ্ধিভ্রংশকারী ; শুধু এই সমৃদ্ধ বিচিত্র বিশাল জড়জগতের কথা নয়, প্রাণমনচেতনার ও তাহাদের ক্রিয়াবলীর ক্রমপরিণতির কথা বলিতেছি, যাহা সমস্তই নিশ্চেতন ইলেক্‌ট্রন কণার রাশি হইতে পরিণত, একই অভিন্ন ইলেকট্রন-কণা, শুধু সংখ্যা ও সংঘটনপদ্ধতিতে ভিন্ন। বিজ্ঞান আমাদিগকে অবশেষে পৌঁছিয়া দেয় একটা প্রহেলিকার মধ্যে, একটা এমন ব্যাপারে যাহা আকস্মিক হইলেও পূর্ব্বনির্দ্ধারিত এবং অটল বিধানানুসারে ব্যবস্থিত, একটা অসম্ভব বস্তু যাহা কোন প্রকারে সম্ভব হইয়াছে ; ইহা আমা-দিগকে দেখাইয়াছে একটা নূতন ভৌতিক মায়া, অঘটনঘটন-পটীয়সী, একটা অলৌকিক ব্যাপার যাহা যুক্তিশাস্ত্রমতে ঘটিতেই পারে না কিন্তু বস্তুতঃ ঘটিয়াছে—যাহা অব্যর্থভাবে সংঘটিত হইয়াছে, অথচ যাহা অযৌক্তিক ও দুর্ব্বোধ্য। এরূপ হইতে পারিয়াছে কেবল এই কারণে যে বিজ্ঞান একটা মূল তত্ত্বকে ভুলিয়াছে ; কি ঘটিয়াছে, কিরূপে ঘটিয়াছে

তাহাও কতকটা, বিজ্ঞান দেখিয়াছে ও আলোচনা করিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া অসম্ভব সম্ভব হইল তাহা দেখিতে পায় নাই—এবস্তুও তাহার প্রকট করা কর্ত্তব্য ছিল। যদি তুমি ভাগবত সত্যকে ধরিতে না পার ত তোমার কাছে বস্তুচয়ের কোন মূল অর্থ নাই ; তুমি আটক পড়িয়া রহিয়াছ বাহিরের একটা স্থূল খোলসের মধ্যে—যে-খোলসকে তুমি আয়ত্ত করিতে পার, কাজে লাগাইতে পার, এই পর্য্যন্ত। দিব্য জাদুকরের জাদুকে তুমি বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু তুমি তাঁহার লীলার যথার্থ মূল ও মর্ম্ম ও চক্র অনুভব করিতে আরম্ভ করিবে শুধু তখনই যখন তুমি তাঁহার চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। "আরম্ভ" বলিতেছি এইজন্য যে ভাগবত সত্য এমন সরল বস্তু নয় যে তোমার প্রথম স্পর্শেই তুমি ইহার সমস্তটাকে জানিতে পারিবে বা ইহাকে একটা সূত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিবে ; ইহা এক সীমাহীন তত্ত্ব এবং তোমার সম্মুখে খুলিয়া ধরে এমন এক অসীম অপার জ্ঞান, যাহার কাছে সমগ্র জড়বিজ্ঞান একত্র করিলেও তুচ্ছ জিনিস বলিয়া জানা যায়। তথাপি তুমি সার-বস্তুকে স্পর্শ করিয়াছ—বস্তুরাজির পশ্চাতে অবস্থিত শাশ্বত তত্ত্বকে—এবং তাহার আলোকে সব কিছু গভীর দীপ্তিতে ভরিয়া যাইতেছে, ঘনিষ্ঠ ভাবে বোধগম্য হইয়া উঠিতেছে।

বস্তুরাজির আড়ালে প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক সত্যের বহিস্তলে (বা প্রতীয়মান বহিস্তলে) কোন কোন সদাশয় বৈজ্ঞানিক যে নিষ্ফল চঞ্চুর আঘাত করিয়া থাকেন সে-সম্বন্ধে আমার মতামত পূর্ব্বে জানাইয়াছি, আর এখানে বেশী কিছু বলিব না। তার চেয়ে বেশী বিপদসঙ্কুল হইল আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাস্তিকেরা, যে নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন

আধ্যাত্মিক ও অতিভৌতিক অনুভূতিরাজির প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে ; কেন না তাঁহাদের নূতন চাল হইল সূক্ষ্ম অনুভূতিরাজিকে অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু তাহাদের মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। ভয়ের খুব ভাল কারণও থাকিতে পারে ; কিন্তু একবার এই সমস্ত বস্তুকে সবিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে, আমার বোধ হয় না যে, মানুষের মন বেশাদিন তুষ্ট থাকিবে এই প্রকার বাজে বাহ্যটিকা-টিপ্পনী লইয়া—এমন টিকা যাহা বোঝাইতে পারে না কিছুই। ধর্ম্মের পক্ষীয় লোকে যখন ধর্ম্মকে সমর্থন করে শুধু এই বলিয়া আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা অন্তর্মুখী প্রামাণিকতা আছে, তখন তাহারা কুতর্ক করিতেছে মাত্র, তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ; তেমনই তাহাদের প্রতি-পক্ষীয়গণও না জানিয়া পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছে, যখন তাহারা জড়বাদ দুর্গের তোরণ খুলিয়া বাহিরে আসিয়া আধ্যাত্মিক ও অতিভৌতিক অনুভূতিকে যাচাইয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম-ব্যাপারকে সর্ব্বথা অগ্রাহ্য করা, তাহাদিগকে যাচাই করিয়া দেখিতে অস্বীকার করাই হইল জড়বাদীর সুরক্ষিত গড়খাই, তাহাদের নিরাপত্তার দুর্গ ; একবার সেই কেল্লা ছাড়িয়া বাহির হইলে মানব-মন আবছায়া নেতি ভাব ত্যাগ করিয়া একটা নিরেট ইতিভাবের দিকে অগ্রসর হইবে—প্রাচীন সব মতবাদের মৃতদেহ, ভৌতিবাদী টিকা-টিপ্পনীরাজির ভগ্নাবশেষ ও নানারূপ চতুর নাম-ধাম বর্ণনাকারী টিকিটকে পদতলে পেষণ করিয়া একটা যাহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় এরূপ ইতিবাদে গিয়া উপস্থিত হইবে। তখন হয়ত আর এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে ; দিব্য সত্যের চরম অস্বীকৃতি নয়, কিন্তু একটা প্রাচীন প্রমাদের নূতন বা

পুরাতন বেশে পুনরাবৃত্তি—একদিকে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক অন্ধ একটা ধর্ম্মনিষ্ঠা, যাহা কোন জীর্ণোদ্ধার বা সংশোধন চায় না, অপরদিকে একটা ঝুটো আধ্যাত্মিকতা বা প্রাণগত সূক্ষ্মবৃত্তির পঙ্কে কি গহ্বরে পতন—যে-সমস্ত প্রমাদ সেকাল ও তাহার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জড়বাদের অভিযানে এক সময়ে যথার্থ শক্তি ছিল। তবে জড়ের অন্ধকার ও পূর্ণ দিব্যদীপ্তির মধ্যস্থ ভূমিতে, সীমান্তে, এইরূপ সব ছায়ামূর্ত্তি সর্ব্বদাই আবির্ভূত হয়। এসব সত্ত্বেও এই অধুনা তমসাচ্ছন্ন পার্থিব চেতনাতে পরম জ্যোতির চরম বিজয়ই হইল একমাত্র ধ্রুববস্তু।

চিত্রকলা, কবিতা, সঙ্গীত, ইহারা যোগ নয়, স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক বস্তু নয়—দর্শন ও জড়বিজ্ঞান যতটুকু আধ্যাত্মিক তদপেক্ষা অধিক নয়। এইখানে আধুনিক মানব-বুদ্ধির একটা আশ্চর্য্য অক্ষমতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; এই বুদ্ধি মন ও আত্মার মধ্যে প্রভেদ করিতে অসমর্থ; মানসিক, নৈতিক তথা সৌন্দর্য্য বিষয়ক আদর্শবাদকে ভ্রমবশে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া গ্রহণ করে; ইহাদের ক্ষুদ্রতর দৃষ্টিতে কোন বস্তুর যে মূল্য তাহাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মূল্য বলিয়া ভুল করে। একথা নিঃসন্দেহ সত্য যে কবির কিংবা সূক্ষ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মানস সম্বোধি অনেকাংশে বাস্তব আধ্যাত্মিক অনুভূতি অপেক্ষা অনেক খাটো; এই সম্বোধিচয় দূরস্থ আলোর চমক, অবাস্তব প্রতিবিম্ব, ধ্রুব দীপ্তি-কেন্দ্র হইতে আগত কিরণমালা নয়। ইহাও কম সত্য নয় যে পর্ব্বত-শিখর হইতে দেখিলে বিশেষ প্রভেদ থাকে না উচ্চ মানস চূড়াতে ও বাহ্য জীবনের নিম্নতর শৈলকূটে আরোহণের মধ্যে। উর্দ্ধের দৃষ্টিতে দিব্যলীলার সকল শক্তিই সমান বোধ হয়, সবগুলিই ভগবানের ছদ্মবেশ। কিন্তু

এ-কথাও বলিতে হয় যে সবগুলিকেই পরিণত করা যায় ঈশ্বরোপলব্ধির প্রথম উপায়ে। আত্মন্ সম্বন্ধে কোন দার্শনিক বিবৃতি একটা মানস কল্পিত সূত্র মাত্র; তাহা জ্ঞানও নয়, অনুভূতিও নয়; তথাপি উহাকেও ভগবান কখন কখন গ্রহণ করেন স্পর্শনের পন্থা বলিয়া; আশ্চর্য্য-ভাবে মনের একটা প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া পড়ে, একটা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, আন্তর কোন অঙ্গে একটা গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, স্বভাবের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে একটা সমভাবাপন্ন অচঞ্চল অনির্ব-চনীয় কিছু। সাধক এক পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াইয়া দেখে, বা অনুভব করে, প্রকৃতির মধ্যে একটা বৈশাল্য, একটা ব্যাপকত্ব, একটা নামহীন বিরাট; তারপর অকস্মাৎ নামিয়া আসে সংস্পর্শ, একটা দিব্য প্রকাশ, একটা প্রবল প্রবাহ, মানসতত্ত্ব নিজেকে হারাইয়া ফেলে অধ্যাত্মতত্ত্বের মধ্যে, সাধক অসীমের প্রথম আক্রমণের সম্মুখীন হয়। অথবা মনে কর যে পূতসলিলা কোন নদীর তীরে এক কালী মন্দিরের সম্মুখে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, কি দেখিতেছ তুমি? সুন্দর সব খোদিত মূর্ত্তি, মনোরম স্থাপত্যের সব নিদর্শন, কিন্তু নিমেষের মধ্যে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত নিগূঢ়-ভাবে আবির্ভুত হইল এক সান্নিধ্য, এক শক্তি, একটি মুখ যাহা তোমার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিতেছে—তখন কি হইল, জান! তোমার কোন আন্তর দৃষ্টি দিব্য বিশ্বজননীর দর্শন পাইল। এইপ্রকার সংস্পর্শ আসিতে পারে শিল্পীর অন্তরে চিত্রকলা বা কবিতা বা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া—আবার তাহারও অন্তরে আসিতে পারে যে বাক্যের সংঘাত অনু-ভব করিয়াছে, রূপের প্রচ্ছন্ন মর্ম্ম বোধ করিয়াছে, ধ্বনির মধ্যে শ্রবণ করিয়াছে এমন এক বাণী যাহা সুররচয়িতা জ্ঞানতঃ প্রকট করেন নাই।

জাগতিক লীলাতে সবকিছুই উন্মুক্ত বাতায়নে পরিণত হইতে পারে যাহার মধ্য দিয়া নিগূঢ় দিব্যসত্যকে দেখা যায়। তথাপি যতদিন মানুষ কেবল জানালার ভিতর দিয়া দেখিয়া তুষ্ট থাকিবে, ততদিন সে যাহা লাভ করিবে তাহা গোড়ার দিকের জিনিষ মাত্র ; একদিন তাহাকে তীর্থযাত্রীর দণ্ড হাতে লইয়া যাত্রা করিতে হইবে সেই স্থানের দিকে যেখানে দিব্যসত্য চিরদিন প্রকটরূপে বিরাজিত। আবছায়া প্রতিচ্ছবির অনুভূতি আত্মাকে তুষ্টি দিতে পারে না, একদিন সেই পরম জ্যোতির সন্ধান করিতেই হইবে যাহাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে এই সমস্ত অস্পষ্ট প্রতিরূপ। কিন্তু এই দিব্য সত্য ও দিব্য জ্যোতি যেমন মর্ত্ত্য-লোকের উৰ্দ্ধস্থ কোন উচচভূমিতে আছে তেমনই আমাদের মধ্যেই আছে, সেইজন্য উহাদের সন্ধান করিবার জন্য আমরা ইহজীবনের অনেক রূপ ও অনেক কর্ম্মকে কাজে লাগাইতে পারি ; ভক্ত যেমন ভগবানকে একটী ফুল বা একটী প্রার্থনা বা একটী কর্ম্ম নিবেদন করে, তেমনই সে নিবেদন করিতেও পারে একটী সুন্দর সৃষ্ট রূপ, একটী গান, একটী কবিতা, একটী মূর্ত্তি বা একটী মধুর সুরতান এবং তাহার মধ্য দিয়া লাভ করিতে পারে একটী স্পর্শ, একটী সাড়া বা একটী অনুভতি। আর যখন সাধক দিব্যচেতনাতে প্রবেশ করিয়াছে বা সেই চেতনা তাহার মধ্যে জাগ্রত হইতেছে, তখনও এই সমস্ত জিনিষের ভিতর দিয়া জীবনে তাহার অভিব্যক্তি যোগের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ; তখনও এইসব সৃজনী ক্রিয়াবলীর আপন স্থান আছে, যদিচ সে স্থান মূলতঃ শ্রেষ্ঠতর নয় অন্যান্য বস্তুর স্থান অপেক্ষা যাহারা ভগবৎ কার্য্যে নিবেদিত হইয়াছে। চিত্র-কলা, কাব্য ও সঙ্গীত উহাদের সাধারণ ক্রিয়াতে যাহা সৃষ্টি করে তাহার

মূল্য প্রাণময় ও মনোময়, আধ্যাত্মিক নয় ; কিন্তু উচ্চতর লক্ষ্য সিদ্ধির দিকে উহাদিগকে ফেরান যায়, এবং তখন উহারা আধ্যাত্মিক স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং যোগজীবনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হয় ; যে কোন বস্তু আমাদের চেতনাকে দিব্যচেতনার সহিত যুক্ত করিতে পারে তাহাই এইরূপ উচ্চতর স্বরূপ লাভ করে। সকল বস্তুই একটা নূতন মূল্য প্রাপ্ত হয় তাহার নিজের দরুন নয়, কিন্তু যে চেতনা তাহাকে কাজে লাগাইতেছে সেই চেতনার দরুন ; কেন না প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য, মূলবস্তু একটী মাত্র আছে দিব্য সত্য সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য, সেই চেতনাতে বাস করিবার জন্য। নিরন্তর সেই চেতনাতে চেতন হইবার জন্য।

২৩-৩-৩২

মধ্যবর্ত্তী স্তর

এই অনুভূতিরাজি সব একই প্রকারের ; ইহাদের একটীর সম্বন্ধে যাহা প্রযুজ্য তাহা অপরগুলির সম্বন্ধে প্রযুজ্য। কতকগুলি স্বরূপতঃ ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়িয়া দিলে বাকী সমস্তগুলি হয় কল্পনার সত্য (idea-truths) যাহা ঊর্দ্ধ্ব হইতে ধারাবদ্ধভাবে চেতনার মধ্যে অবতীর্ণ হয় যখন মানুষ সত্তার বিশিষ্ট কতকগুলি ভূমির সহিত সংস্পর্শে আসে, নয়ত তাহারা বৃহত্তর মনোময় ও প্রাণময় জগৎসমূহ হইতে আগত সুদৃঢ় রূপরাজি যাহারা সবেগে নামিয়া আসে আপন সার্থকতার জন্য সাধককে লইয়া কাজ করিবে বলিয়া। এইসব বস্তু, যখন তাহারা চেতনাতে প্রবিষ্ট হয় বা ধারা-নিবদ্ধ হইয়া নামে, তখন তাহারা একটা প্রচণ্ড শক্তি, একটা প্রেরণা বা উদ্দীপনার সুস্পষ্ট বোধ, একটা জ্যোতি ও হর্ষের অনুভূতি একটা প্রসার ও সামর্থ্যের ধারণা সঙ্গে লইয়া আসে। সাধক অনুভব করেন যেন তিনি নিত্যকার সীমাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণতর বৃহত্তর উচ্চতর অনুভূতির আশ্চর্য্য নবীন জগতে উন্নীত হইয়াছেন ; উপরন্তু যাহা কিছু আসে তাহা মিলিয়া যায় তাঁহার আস্পৃহা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আধ্যাত্মিক সার্থকতা ও যৌগিক সিদ্ধির সহিত ; মনে হয় যেন উহারাই সেই সার্থকতা ও সেই সিদ্ধি। তিনি সহজেই মোহিত হন অনুভূতিরাজির উজ্জ্বল দীপ্তি ও বেগের দ্বারা, এবং বস্তুতঃ যতটা উপলব্ধি করিয়াছেন তদপেক্ষা বেশী উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া ভাবেন চরম কিছু অথবা অন্ততঃ পরম সত্য কিছু। এই স্তরে সাধকদের ততটা

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নাই যাহা তাঁহাকে বলিয়া দিবে যে ইহা একটা নিতান্ত অনিশ্চিত ও বিমিশ্র আবস্ত মাত্র ; তিনি হয়ত তখনই বুঝিবেন না যে তিনি এখনও বিশ্বগত অবিদ্যাতে রহিয়াছেন, বিশ্বগত সত্যে নয়, বিশ্বাতীত সত্যে ত নয়ই, এবং যাহা-কিছু রূপায়ণ-ক্ষম বা গতিশীল কল্পনা-সত্য তাঁহার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে তাহা আংশিক মাত্র, এবং এখনও মিশ্র চেতনার মধ্য দিয়া আসিয়াছে বলিয়া আরও অস্ফুট। হয়ত সাধক ইহাও বুঝিতে পারিবেন না যে তিনি যেটুকু পাইতেছেন বা উপলব্ধি করিতেছেন তাহাকে সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট কিছু ভাবিয়া যদি তিনি তাড়াতাড়ি প্রয়োগ করিতে যান তাহা হইলে তিনি হয় প্রমাদে বা গণ্ডগোলে পতিত হইবেন, নয়ত একটা আংশিক রূপায়ণের মধ্যে আটক পড়িবেন, যাহার মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক সত্য থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা খুব সম্ভবতঃ বহু প্রাণময় ও মনোময় ক্রিয়ার দ্বারা একেবারে বিকৃত। যখন তিনি (তৎক্ষণাৎ বা কিছুকাল পরে) তাঁহার অনুভূতিচয় হইতে পিছু হটিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, নিরপেক্ষ সাক্ষী-চেতনাতে দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন তাহাদের যথার্থ স্বরূপ, সীমাবন্ধন, উপাদান, সংমিশ্রণ, কেবল তখনই তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন যথার্থ স্বাধীনতার দিকে, একটা উচ্চতর-বৃহত্তর, ধ্রুবতর সিদ্ধির দিকে। প্রতি পদেই এইরূপ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। কেন না পূর্ণযোগের সাধকের কাছে এই-রূপে যাহাই আসুক না কেন—অধিমানস হইতে হোক বা সম্বোধি হইতে হোক বা দীপ্ত মানস হইতে হোক বা কোন উর্দ্ধতন প্রাণভূমি হইতে হোক বা এই সমস্ত ভূমিচয় হইতে হোক, তাহা সুনির্দ্দিষ্ট এবং চরম বস্তু নয় ; তাহা সেই পরম সত্য নয় যাহার মধ্যে সাধক

থামিয়া যাইতে পারেন, তাহা একটা স্তর মাত্র। তথাপি এই সব স্তরের মধ্য দিয়া সাধককে যাইতেই হইবে, কারণ অতিমানস বা পরম সত্যকে এক লম্ফে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, একাধিক লম্ফেও নয়; বহু মধ্যবর্ত্তী স্তরের ভিতর দিয়া স্থির ধীর শান্ত ভাবে উঠিয়া যাইতে হইবে। কোন স্তরের অপূর্ণ সত্য বা দীপ্তি বা শক্তি বা আনন্দের দ্বারা আবদ্ধ হইলে চলিবে না, তাহাদের মধ্যে আটকাইয়া পড়িলে চলিবে না।

বস্তুতঃ সাধারণ মানস চেতনা হইতে যথার্থ যৌগিক জ্ঞানে উঠিয়া যাইবার পথে ইহা হইল একটা মধ্যবর্ত্তী ভূমি। ইহার ভিতর দিয়া মানুষ অক্ষত অবস্থায় চলিয়া যাইতে পারে, যদি সে তখনই বা খুব শীঘ্র ইহার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারে, যদি সে ইহার অর্দ্ধদীপ্তির মাঝে ও ইহার মনভুলানো অনুভূতিরাজির মাঝে আটক না পড়ে—যে অনুভূতিরাজি অপূর্ণ ও বিমিশ্র, এবং মানুষকে বিপথে লইয়া যায়; এখানে মানুষ সহজেই পথ হারাইতে পারে, অলীক বাণী ও মিথ্যা চালনার অনুসরণ করিতে পারে—তাহার পরিণাম একটা আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয়; অথবা হয়ত মানুষ রহিয়া যাইতে চাহিবে এই মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রে, আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিয়া এখানেই একটা অর্দ্ধসত্য নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকেই পূর্ণসত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে; অথবা এই সমস্ত ভূমির শক্তিরাজির খপ্পরে পড়িবে—অনেক সাধকের ও যোগীর এইরূপ হইয়া থাকে। একটা অতিভৌতিক অবস্থার অসাধারণ শক্তির অনুভূতি এবং সেই শক্তির বেগে অবতরণ মানুষকে অভিভূত করে; সেই অবস্থায় অপেক্ষা-কৃত অল্প দীপ্তি তাহার চোখে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়, সে উহাকে মনে করে

একটা প্রচণ্ড জ্যোতি; অথবা একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য শক্তির স্পর্শকে সে ভাবে ভাগবত শক্তি বা অন্ততঃপক্ষে একটা অতিপ্রবল যোগ-শক্তি; অথবা সে একটা মধ্যবর্ত্তী শক্তিকে (যাহা সব সময়ে আদৌ ভগবানের শক্তি নয়) মনে করে পরম শক্তি, মধ্যবর্ত্তী একটা চেতনাকে মনে করে পরম সিদ্ধি। অতি সহজেই মানুষ ভাবে যে সে পূর্ণ বিশ্ব-চেতনাতে প্রবেশ করিয়াছে যখন সে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সামান্য একটা অংশ বা ভাব মাত্র, কিংবা যখন সে শুধু একটা বৃহত্তর মন বা প্রাণশক্তি বা সূক্ষ্ম ভৌতিক তত্ত্বের সহিত সচল সংস্পর্শে আসিয়াছে। অথবা মানুষ হয়ত মনে করে যে সে পরিপূর্ণ দীপ্ত চেতনাতে রহিয়াছে যখন বস্তুতঃ সে যাহা পাইতেছে তাহা ঊর্দ্ধ্ব হইতে আংশিকভাবে কোন মনোময় কি প্রাণময় ভূমি হইতে অর্দ্ধদীপ্তির মধ্য দিয়া; কেন না যাহা আসে তাহা এই সমস্ত ভূমি দিয়া আসিতে আসিতে অস্পষ্ট এবং অনেক সময়ে বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়; সাধকের নিজের মন প্রাণ যাহা এইসব বস্তু গ্রহণ করিতেছে তাহাও সবসময়ে পূরাপূরি বুঝিতেও পারে না, বুঝাইতেও পারে না, হয়ত বা তাহার সহিত মিশাইয়া দেয় আপন কল্পনা-ধারণা ভাব-আবেগ ও বাসনা-কামনা; মিশাইয়া দেয় বটে কিন্তু না জানিয়া বুঝিয়া; তাহার ধারণা এই যে এ সমস্তই অবতীর্ণ দিব্য সত্যের অংশ, কেন না ইহারা সেই সত্যের সহিত মিশ্রিত, তাহার জ্যোতিতে দীপ্ত, তাহার রূপের অনুকরণে রূপায়িত এবং এই সংসর্গ ও ধার-করা আলোর জন্য অধিক মূল্যবান।

ইহা অপেক্ষাও বেশী বিপদ আছে অনুভূতির এই মধ্যবর্ত্তী স্তরে। কেন না সাধক এখন যে-সব ভূমির পানে নিজের চেতনাকে খুলিয়া

দিয়াছে—আব আগের মত যে ক্ষণিক দর্শন ও ক্ষণিক প্রভাব পাইতেছে তাহা ত নয়, এখন সাক্ষাৎভাবে পূর্ণ সংঘাত পাইতেছে—সেই সব ভূমি এখন পাঠাইতেছে রাশি রাশি কল্পনা প্রেরণা সূচনা, যাহারা পরস্পর-বিরোধী ও অসমঞ্জস, কিন্তু সাধকেব সম্মুখে তাহাবা এমনভাবে এত জোরে এতটা আশ্বাসসহ এতটা তর্ক-যুক্তিসহ উপস্থাপিত হয় যে তাহাদের দোষ-ত্রুটি বিরোধ-অসঙ্গতি সব চাপা পড়িয়া যায়। যেসব অনুভূতি আসে তাহারা এত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, এত সমৃদ্ধ ও প্রচুর, এতটা ধ্রুব যে সাধকের মন তাহার দ্বারা অভিভূত হয, একটা প্রবল বিপর্য্যয়ের মাঝে পড়িযা ভাবে যে একটা বৃহত্তর সঙ্গতি ও সুশৃঙ্খলার মধ্যে সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; অথবা একটা অবিরাম অদলবদল পবিবর্ত্তনের ঘুর্ণীর মাঝে পড়িয়া মনে করে যে খুব দ্রুত উন্নতি সাধিত হইতেছে, কিন্তু সত্য সত্যই কোন কুল কিনারা পায না। বিপরীত দিকেও আবার এই বিপদ আছে যে সাধক উজ্জ্বলবৎ প্রতীয়মান কোন অন্ধকার শক্তির খপ্পরে পডিতে পারে, কেন না এই সমস্ত মধ্যবর্ত্তী লোক ক্ষুদ্র উপদেবতা ও প্রবল দৈত্য বা ক্ষুদ্রতর সত্তাসমূহে পূর্ণ যাহা আপন আপন নূতন সৃষ্টি করিতে উৎসুক, যাহারা নিজবলে এই পার্থিব জীবনে একটা নূতন মনোময ও প্রাণময় রূপ সৃজন করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইচ্ছা ও সংকল্পকে আপন আয়ত্তাধীন করিয়া তাহাকে আপন যন্ত্রে পরিণত করিতে একান্ত ব্যগ্র। ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইল বাস্তবিক প্রতিকূল শত্রুসত্তাচয়ের নিকট হইতে আগত বিপদ, যাহার কথা আমরা উত্তমরূপেই জানি ; এই সব সত্তার একমাত্র লক্ষ্য হইল সাধনাতে গণ্ডগোল, মিথ্যা ও বিকৃতি উৎপন্ন করা, বিপদসঙ্কুল ভ্রমপ্রমাদাদি লইয়া আসা যাহারা আদৌ আধ্যাত্মিক বস্তু।

নয়। এরূপ কোন সত্তা (যাহারা অনেক সময়ে দিব্য নাম গ্রহণ করে) যদি সাধককে ধরে ত মানুষ সাধনা মার্গে তাহার পথ হারাইবে। অপর পক্ষে, এরূপও সম্ভবপর যে সাধক এইভূমিতে প্রবেশকালে দ্বারেই কোন ভাগবত শক্তির সাক্ষাৎ পাইবেন যাহা তাঁহাকে সাহায্য করিবে এবং হাতে ধরিয়া লইয়া চলিবে যতদিন না তিনি মহত্তর বস্তুরাজির জন্য প্রস্তুত হন; কিন্তু তথাপি এই ভূমির ভ্রম পদস্খলনাদির বিপদ থাকিবেই; কেননা এখানকার শক্তিরাজিব পক্ষে বা অদিব্য শত্রুশক্তিচয়ের পক্ষে অতিসহজ দিব্য চালকেব কণ্ঠস্বর বা মূর্ত্তির অনুকরণ করিয়া সাধককে প্রবঞ্চনা করা বা বিপথে লইয়া যাওয়া; সাধকের নিজের পক্ষেও খুব সহজ তাহার আপন মন-প্রাণ-অহমিকাব সৃষ্ট রূপরাজিকে দিব্য সৃষ্টি বলিয়া মনে কবা।

কারণ এই মর্ত্ত্যভূমি অর্দ্ধসত্যের রাজ্য; শুধু তাহাতে আসিয়া যাইত না, কেন না অতিমানসের নীচে পূর্ণসত্য নাই; কিন্তু এখানকার অর্দ্ধসত্য প্রয়োগকালে এতটা অপূর্ণ এতটা অস্পষ্ট যে তাহার মধ্যে গণ্ডগোল প্রমাদ বিভ্রমেব স্থান বিস্তর রহিয়াছে। সাধক একটা বৃহত্তর সমর্থতর কিছুর সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এইরূপ অনুভব করেন বলিয়া ধরিয়া লন যে আর তিনি পুবাতন ক্ষুদ্রচেতনার মধ্যে মোটেই নাই, কিন্তু বস্তুতঃ পুরাতন চেতনা এখনও রহিয়াছে, তিরোহিত হয় নাই। সাধক আপনার চেয়ে বড় সূক্ষ্ম শক্তি বা সামর্থ্য বা সত্তার প্রভাব ও চালনা অনুভব করেন, তাহাব যন্ত্র হইবার জন্য ব্যাকুল হন, মনে করেন যে অহমিকার কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই অহমিকার বিভ্রমের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে একটা অতিস্ফীত অহমিকা।

কল্পনা-ধারণা সব আসিয়া তাহাকে ধরে, এবং তাহার মনকে চালিত করে, কিন্তু ইহারা অংশতঃ মাত্র সত্য এবং বাহাদুরীর বশে ভুল প্রয়োগ করিতে গিয়া অসত্যে পরিণত হয় ; তাহার ফলে চেতনার গতিবৃত্তি দূষিত হয়, ভ্রম-প্রমাদ আসিয়া পড়ে। নানা চটকদার ইঙ্গিত সূচনা সব আসে, যাহারা সাধকের মনস্তুষ্টি সাধন করে, যাহারা তাঁহার নিজ বাসনারই অনুরূপ ; ফলে তিনি কোন বিচাব বা পরীক্ষা না করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। যেটুকু সত্য তাহাকেও তাহার গণ্ডী ছাড়াইয়া এতটা অযথা বড় করিয়া দেখা হয় যে তাহা ভুলভ্রান্তি ডাকিয়া আনে। অনেক সাধককেই এই ভূমি পার হইতে হয় ; তাঁহারা বহুজন ইহার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, অনেকে কখনও বাহির হইয়া আসিতে পারেন না। বিশেষ করিয়া যাঁহাদের সাধনা প্রাণ-মনোগত তাঁহাদিগকে বহু বাধাবিঘ্ন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইতে হয় ; যাঁহারা যত্নপর্ব্বক একটা কড়া শাসনের অনুসরণ করেন, যাঁহাদের প্রকৃতিতে চৈত্য পুরুষ মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছেন, শুধু তাঁহারাই নিরাপদে যেন একটা বাঁধা সড়কের উপব দিয়া, এই ভূমি পার হইয়া যান। একটা কেন্দ্রগত সরলতা, একটা মূল বিনয়ও সাধককে অনেক কষ্ট ও বাধাবিপত্তি হইতে রক্ষা করে। মানুষ তখন অবিলম্বে এই ভূমি অতিক্রম করিয়া স্পষ্টতর আলোকে প্রবেশ করিতে পারে, যেখানে এখনও অনেকখানা সংমিশ্রণ, অনিশ্চয় ও ধ্বস্তাধ্বস্তি থাকিলেও মোটামুটি একটা গতি আছে বিশ্বসত্যের পানে, মায়া ও অজ্ঞানের অর্দ্ধ-দীপ্ত প্রকাশের পানে নয়। আমাদের সাধারণ চেতনার ঠিক বাহিরে যে চেতনা, তাহার অবস্থা এবং তাহার স্বরূপ ও সম্ভাবনারাজি আমি

মোটামুটি বিবৃত করিলাম এইজন্য যে এইসব অনুভতি ঐ চেতনাভূমিতেই বিচরণ করে। কিন্তু বিভিন্ন সাধক বিভিন্নভাবে এই ভূমিতে থাকেন, কেহ বা একপ্রকারের সম্ভাবনারাজিকে সাড়া দেন, কেহ বা অন্যপ্রকারকে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সাধক এই ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন বিশ্বচেতনাকে নামাইয়া আনিবার বা তাহাব মধ্যে সবলে প্রবেশ করিবার চেষ্টার ফলে— কিন্তু ঠিক কোন চেষ্টাটীর ফলে, বা তিনি তাঁহার সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন কি না, তাহাতে কিছু আসে যায না, বস্তুতঃ দুটী একই কথা। সাধক যে অধিমানসভূমিতে প্রবেশ করেন নাই ইহা নিশ্চিত, কেন না সোজাসুজি অধিমানসে প্রবেশ কবা যায় না। বাস্তবিক বলিতে বিশ্বচেতনার সমগ্র ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে ও পশ্চাতে অধিমানস সদাই রহিয়াছে কিন্তু আরম্ভে আমরা তাহার সঙ্গে একটা পরোক্ষ সম্বন্ধমাত্র স্থাপন করিতে পারি; বস্তুচয় সেখান হইতে মধ্যবর্ত্তী ভূমিরাজির ভিতর দিয়া বৃহত্তর মনোভূমি প্রাণভূমি ও সূক্ষ্ম জড়ভূমির মধ্যে নামিয়া আসে, আসিয়া পৌঁছায় ক্ষীণতর ও খুব পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে, অধিমানস ক্ষেত্রে নিজ-ভূমিতে তাহাদের যে সত্য ও শক্তি ছিল তাহার অনেকখানাই হারাইয়াছে। গতিধারাসমূহ বেশীর ভাগ আসিতেছে অধিমানস হইতে নয়, উচচতর মানসক্ষেত্ররাজি হইতে। এই অনুভূতিসমূহ যে কল্পনাধারণার দ্বারা পূরিত, যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের সত্যের দাবী, সেই কল্পনা-ধারণাচয় অধিমানসের নয়, তাহারা আসিতেছে ঊর্দ্ধমানস হইতে বা কখন কখন দীপ্ত মানস হইতে; কিন্তু তাহারা অধস্তন মন-প্রাণ ভূমি হইতে আগত সূচনাচয়ের সহিত মিশ্রিত,—প্রয়োগকালে নিতান্ত হীন-ক্ষীণ অথবা অনেক সময়ে অপপ্রযুক্ত। এসবে কিছু আসিয়া যাইত না;

এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, হইয়াই থাকে, ইহার মধ্য দিয়াই উঠিতে হয় উজ্জ্বলতর ভূমিতে যেখানে সব কিছু আরও সুসম্বদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সমস্ত গতিবৃত্তির মূলে ছিল একটা হঠকারিতা ও অতিব্যগ্রতা, একটা দম্ভ ও দর্প, একটা অত্যধিক নিশ্চয়ের ভাব, নির্ভর যেটুকু তাহা শুধু নিজের মনের চালনার উপর, নয়ত নিজের নিতান্ত সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা কল্পিত ও উপলব্ধ "ভগবান"-এর উপর। ভগবানের সম্বন্ধে সাধকের কল্পনা-ধারণা মূলতঃ খাঁটি হইলেও এই স্তরে উহা কখনই পরিপূর্ণ ও অবিমিশ্র হয় না ; উহার সহিত মেশান থাকে মন-প্রাণের নানা প্রতীতি, আর এই দিব্যচালনার সহিত এমন সব বস্তু সম্বদ্ধ, এমন সব বস্তুকে সাধক এই চালনার অঙ্গীভূত মনে করেন যাহারা আসিতেছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন উৎস হইতে। সাক্ষাৎ চালনা কিছু আছে এরূপ ধরিয়া লইলেও তাহা সাময়িক, বাকী সমস্তটাই শক্তিরাজির খেলার পরিণাম ; ভগবৎ-চালনা যেটুকু আছে তাহা আবরণের পশ্চাৎ হইতে ; ভ্রমপ্রমাদ, পদস্খলন, অজ্ঞানের সংমিশ্রণ খুবই আছে---আছে এই জন্য যে বিশ্বশক্তিচয় কর্তৃক সাধকের পরীক্ষা আবশ্যক, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহার শিক্ষা আবশ্যক, অপূর্ণতার ভিতর দিয়া তাহার পূর্ণতার উত্থান আবশ্যক, যদি তাহার ক্ষমতা থাকে, যদি তাহার শিখিবার ইচ্ছা থাকে, যদি সে তাহার ভ্রমপ্রমাদকে চোখ খুলিয়া দেখিতে চায়, যদি দেখিয়া শিখিতে চায় যে কেমন করিয়া শুদ্ধতর সত্য, জ্যোতি ও জ্ঞানের দিকে বাড়িয়া উঠিতে হইবে।

মনের এই অবস্থার পরিণাম এইরূপ হয় যে এই বিমিশ্র ও সংশয়াত্মক ভূমিতে যাহা কিছু আসে তাহাকে মানুষ পূর্ণসত্য ও শুদ্ধ ভগবানের

ইচ্ছা বলিয়া বিবৃত করিতে আরম্ভ করে ; যে সমস্ত কল্পনা ও সূচনা বারবার আসে তাহারা এতটা নিশ্চয় ও এতটা জোরের সহিত ঘোষিত হয় যেন তাহারা সমগ্র ও অবিসম্বাদী দিব্য সত্য। এমন একটা ভাব দেখান হয় যেন সাধক নৈর্ব্যক্তিক ও অহমিকামুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার মনেব সমগ্র ধারা, তাহার অভিব্যক্তি ও ভাব প্রবল আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ, যেন সাধক যাহাকিছু ভাবিতেছেন বা করিতেছেন সমস্তই ভগবানের যন্ত্ররূপে, তাঁহাবই প্রেরণাবশে। খুব জোর করিয়া এমন সব কল্পনা-ধারণা উপস্থাপিত করা হয় যাহা মনের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে অপ্রযুজ্য ; অথচ এমন ভাব দেখান হয় যেন তাহারা নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ লওয়া যায় সমতা, যাহা ঐ অর্থে মানসনীতি, একটা বিশুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যের দাবী, কাহাকেও গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি, দিব্যতত্ত্ব ও মানুষী দিব্যতত্ত্বের মধ্যে বিরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি—যৌগিক সমতা কিন্তু একটা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। এই সমস্ত কল্পনা-ধারণা মনোগত ও প্রাণগত ভাব, যাহা মন-প্রাণ ধার্ম্মিক (এমন কি, আধ্যাত্মিক) জীবনের উপর চাপাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু যাহারা স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক নয়, হইতে পারে না। আবার প্রাণভূমিরাজি হইতে নামিয়া আসে সূচনাবলী যাহারা উদ্ভূত হইয়াছে চটকদার চতুর কাল্পনিক সব খেয়াল হইতে বা প্রচ্ছন্ন টিকা বা অলীক প্রেরণা বা সূক্ষ্মবস্তুরাজির ইঙ্গিত হইতে ; ইহারা মনকে বিমুগ্ধ বা উত্তেজিত করে এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহা সাধকের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতাকে তুষ্ট ও বর্দ্ধিত করে, কিন্তু যাহা কোন সুনির্দ্দিষ্ট আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা সূক্ষ্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই

মধ্যভূমি এইরূপ সব বস্তুতে পূর্ণ ; তাহাদিগকে বাধা না দিলে তাহারা চারিদিক হইতে সাধককে ঘিরিয়া আসে ; সাধক যদি যথার্থই সর্বোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে চান ত এবম্বিধ সব বস্তুকে একবার নজব করিয়া পাশ কাটাইয়া আগে চলিয়া যাইতে হইবে। এইসব জিনিসে যে কখন কোন সত্য নাই, এরূপ নয় ; তবে একটী সত্য থাকিলে তার সঙ্গে সঙ্গে কয়টী অসত্য মেকী জিনিস আছে ; এই গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ধরা না পড়িয়া, ঠোক্কর না খাইয়া, পথ খুঁজিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারেন শুধু শিক্ষিত সূক্ষ্মদর্শী জন যাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে। সাধকের সমগ্র মূলভাব ও কার্য্য ও বাক্য এই মধ্যবর্ত্তী ভূমির ভ্রমপ্রমাদের দ্বারা এমন ভরপুর হইয়া যাইতে পারে যে এই পথে আর অগ্রসর হইলে ভগবান ও যোগসিদ্ধি হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে হইবে।

এখানে সাধক এখনও নিজের ইচ্ছায় স্থির করিয়া লইতে পারেন যে এই সমস্ত অনুভূতির মাঝে যে বিচিত্র চিত্র চালনা পাওয়া যায় তাহাই তিনি অনুসরণ কবিবেন, না যথার্থ চালনার অনুগামী হইবেন। প্রত্যেক সাধক, যিনি যৌগিক অনুভূতির রাজ্য-সমূহে প্রবেশ কবিয়াছেন, তাঁহার আপন ইচ্ছানুরূপ মার্গ অনুসরণ কবিবার অধিকার আছে ; কিন্তু আমাদের এই মার্গ ত সবার পথ নয়, ইহা শুধু তাহাদেরই জন্য যাহারা নির্দ্দেশ অনুযায়ী লক্ষ্য সন্ধান করিতে, পন্থা অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হইবে ; সে-পথে ধ্রুব চালনা অপরিহার্য্য। এরূপ আশা করিয়া কোন লাভ নাই যে যথার্থ সহায়তা ও প্রভাব ব্যতিরেকে শুধু নিজের অন্তরের শক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা এই পথে কেহ বেশী দূর যাইতে পারে,—শেষ অবধি ত পারেই না। সাধারণ দীর্ঘকালব্যাপী যোগাভ্যাসগুলিও গুরুর সাহায্য

বিনা আয়ত্ত করা কঠিন ; আমাদের এই পথে অগ্রসর হওয়া ত একেবারে অসম্ভব, কেন না এখানে সাধক যত অগ্রসর হইবে ততই তাহাকে অনাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত নূতন জটিল ভূমির মধ্য দিয়া চলিতে হইবে। এ পথে যে-কাজ করিতে হইবে তাহাও অপর পন্থার সাধকের কাজ নয় ; তাহা নৈর্ব্যক্তিক ভগবানের কাজ নয়, যিনি, সত্য বলিতে সক্রিয় শক্তিই নহেন, যিনি বিশ্বের সকল ক্রিয়াকে নিরপেক্ষভাবে ধরিয়া রহিয়াছেন। যাহারা পূর্ণযোগেব দুর্গম জটিল পন্থা অনুসবণ করিবে শুধু তাহাদের জন্যই এই ভূমি হইল শিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে সকল কর্ম্মই করিতে হইবে একটা স্বীকৃতি সংযম ও নিবেদনের ভাব লইয়া, ব্যক্তিগত সর্ত্ত দাবীদাওয়া কিছু থাকিলে চলিবে না, ধ্রুব চালনা ও ধ্রুব নিয়মনের কাছে সজাগ সতর্ক আত্মসমর্পণ একান্ত আবশ্যক। অন্য কোন ভাব লইয়া কর্ম্ম করিলে একটা গণ্ডগোল বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভের পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। তবে এপথেও বাধাবিপত্তি, ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন অনেক আছে, কেন না এখানেও সাধককে ধীবে ধীরে আগাইয়া লইয়া যাওয়া হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাকে তাহার নিজের অভিজ্ঞতার বলে, তাহার নিজের চেষ্টাতে, মন প্রাণ ক্ষেত্রের সাধারণ অজ্ঞান হইতে একটা বৃহত্তর চেতনাতে ও দীপ্ততর জ্ঞানে উঠিয়া যাইবার সুযোগও দেওয়া হয়। কিন্তু সীমানাব ঠিক পরপারের ভূমিচয়ে চালকহীন অবস্থায় পরিভ্রমণের বিপদ হইল এই যে যোগের মূল ভিত্তি অবধি বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে, এবং সাধনার অনুকূল পরিবেশ একেবারে হারাইয়া যাইতে পারে। এই মধ্যবর্ত্তী ভূমির ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া একটা সঙ্গীন ব্যাপার—ইহা অপরিহার্য্য নয়, কেন না অনেকে

একটা সঙ্কীর্ণতর কিন্তু নিরাপদ পথ ধরে। এই বিপদসঙ্কুল ভূমি উত্তীর্ণ হইলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহা হইল একটা অতিবিশাল ও অতিসমৃদ্ধ সৃষ্টি ; কিন্তু পদস্খলন হইলে সামলান দুরূহ ও কষ্টকর—শুধু সুদীর্ঘ প্রয়াস ও মল্লযুদ্ধেব দ্বারাই তাহা সম্ভবপর।

৬-১১-৩২

বিশ্বব্যাপী সত্য ও বিশ্বব্যাপী অজ্ঞান

এমন কোন অজ্ঞান নাই যাহা বিশ্ব-জোড়া অজ্ঞানের অংশ নয়, তবে ব্যক্তি-আধারে উহা একটা সসীম রূপায়ণ ও সসীম গতিধারা হইয়া যায়, আর বিশ্বব্যাপী অজ্ঞান হইল বিশ্বচেতনার সমগ্র গতিবৃত্তি, যাহা পরম সত্য হইতে বিচ্যুত এবং একটা নিকৃষ্ট ধারাতে ক্রিয়মাণ, যে ক্রিয়াধারাতে, দিব্য সত্য হইয়াছে বিকৃত, খর্ব্ব, মিশ্র এবং অসত্য ও বিভ্রমের দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন। বিশ্বব্যাপী সত্য হইল সৃষ্টবস্তুরাজির উপর বিশ্বচেতনার দৃষ্টি, যাহাতে ঐ বস্তুরাজি দৃষ্ট হয় তাহাদের যথার্থ মূল স্বরূপে, ভগবানের সহিত তাহাদের যথার্থ সম্বন্ধের মধ্যে এবং তাহাদের পরস্পরের যথার্থ সম্বন্ধের ভিতরে।

সাম্য ও যৌগিক সমতা

যৌগিক সমতা হইল আত্মার সমভাব, সেই সমভাব যাহার ভিত্তি হইল অখণ্ড এক আত্মার বোধ, সর্ব্বত্র ভগবানের বোধ—প্রকট ভুবনে সব-কিছুর ভেদ, শ্রেণীবিভাগ ও বৈষম্য সত্ত্বেও সর্ব্বত্র অদ্বিতীয় একের দর্শন।

সাম্যের যে মানসধারা, তাহা ভেদ-বিভেদ-বৈষম্যকে অগ্রাহ্য করিতে বা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে, এমনভাবে কাজ করে যেন সবকিছু সমান অথবা চেষ্টা করে সবকিছুকে সমান করিয়া লইতে। রামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়ের মত ; রামকৃষ্ণের স্পর্শ লাভ হইলেই সে চীৎকার করিয়া উঠিত, "রামকৃষ্ণ, তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম ; দুজনের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।" এইরূপ চেঁচাইত, চুপ করিত না, যতক্ষণ না রামকৃষ্ণ তাঁহার শক্তি সংহরণ কবিতেন। অথবা সেই শিষ্যের মত যে মাহুতের বারণ না মানিয়া হাতীর সম্মুখে দাঁড়াইল এই বলিয়া, "আমি ব্রহ্ম" ; দাঁড়াইয়া রহিল যতক্ষণ না হস্তী তাহাকে শুণ্ডদ্বারা তুলিয়া পাশে সরাইয়া দিল। যখন শিষ্য গুরুর কাছে অনুযোগ করিল তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু তুমি মাহুতব্রহ্মের কথা কেন শুনিলে না ? সেই জন্যই ত হস্তীব্রহ্ম তোমাকে শুণ্ড দ্বারা তুলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিলেন, যেখানে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।" প্রকট বিশ্বে পরম সত্যের দুই ভাব রহিয়াছে, তাহার কোনটাই তুমি বাদ দিতে পার না।

মূল প্রভেদ

মূল প্রভেদ হইল এই শিক্ষাতে যে একটা সক্রিয় দিব্য সত্য আছে (অতিমানস), এবং সেই সত্য বর্ত্তমান অজ্ঞানময় জগতে অবতীর্ণ হইতে পারে, একটা নূতন ঋতচিৎ সৃষ্টি করিয়া জীবনকে দিব্য রূপ দিতে পারে। প্রাচীন যোগসাধনাগুলি মন হইতে সোজা নিরপেক্ষ

কেবল ব্রহ্মতত্ত্বে উঠিয়া যায়, সমগ্র সচল জীবনকে অজ্ঞান বা মায়া বা লীলা বলিয়া ভাবে ; তাহাদেব মতে তুমি যখন অচল অবিকারী দিব্য সত্যে প্রবেশ কর, তখন তুমি বিশ্বজীবনের বাহিরে চলিয়া যাও।

ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সত্য

"যদি অতিমানস সত্য ছাড়া আর সবকিছু অসত্য হয় তাহা হইলে অধস্তন অধিমানস ভূমি কিরূপে পথ হইতে পারে অতিমানসের সম্ভাবনাতে উঠিবার ?"

আমি ত একথা বলি নাই যে অতিমানস সত্য ব্যতিরেকে অপর সব কিছু অসত্য। আমি বলিয়াছিলাম যে অতিমানসের নীচে কোথাও পূর্ণ সত্য নাই। অধিমানস ক্ষেত্রে অতিমানসের পরিপূর্ণ সুসঙ্গত সত্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ; নানা সত্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়, প্রত্যেকটী নড়ে চড়ে নিজের সার্থকতার জন্য, নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য,—বিবিধ বিভিন্ন সত্য বা সত্যের শক্তিরাজির মিলনে সংগঠিত বর্ত্তমান জগৎসমূহে প্রাধান্য-লাভের জন্য বা অপরাপর শক্তির সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিবার জন্য। আরও অধস্তন ক্ষেত্রে ভাগ-বিভাগ আরও স্পষ্ট হয়, বিভ্রম, অসত্য, অজ্ঞান এবং পরিশেষে নিশ্চেতনা (যেমন জড়বস্তুতে) আসিয়া স্থান পায়। আমাদের এই জগৎ নিশ্চেতনা হইতে উদ্ভূত হইয়া মানস চেতনা অবধি উত্থিত হইয়াছে—(মন, যাহা অজ্ঞানের যন্ত্র কিন্তু যাহা বিস্তর সীমাবন্ধন বিরোধ,

বিপর্য্যয় ও প্রমাদের মধ্য দিয়া দিব্য সত্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছে। অধিমানসভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, যদি তাহা সম্পূর্ণরূপে করা যায়, (শরীরী জীবের পক্ষে তাহা সহজ নয়) মানুষ অতিমানস সত্যের সীমান্তে দাঁড়াইল সেখানে প্রবেশ করিবে এই আশাতে।

৭-১১-৩২

বিশ্বাস সম্বন্ধে একটি সমস্যা

এই দুই ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন কিরূপে করা যায় :—

১। সকল ঘটনা ও সকল গতিবিধির পশ্চাতে রহিয়াছে ভগবানের ইচ্ছা ;

২। ভুবনে অভিব্যক্তিতে ভাগবত সংকল্প বিকৃত হইয়াছে।

বিশ্বাস দুই প্রকারের হইয়া থাকে :—

(যে-বিশ্বাস সমতা নামাইয়া আনে এবং যে-বিশ্বাস সিদ্ধি নামাইয়া আনে।)

এই দুই বিশ্বাস ভগবানের দুই বিভিন্ন মূলভাবের সহিত সম্বদ্ধ।

(বিশ্বগত ভগবানও আছেন, আবার বিশ্বাতীত ভগবানও আছেন।

সিদ্ধির সংকল্প হইল বিশ্বাতীতের সংকল্প।

বিশ্বগত ভগবান হইলেন তিনি, যাঁহার সহিত বর্ত্তমান অবস্থাতে সবকিছুর বাস্তব ক্রিয়াধারা সম্বদ্ধ। এই বিশ্বগত ভগবানের ইচ্ছাই বিশ্বের প্রত্যেক ঘটনাতে, প্রত্যেক গতিবৃত্তিতে প্রকট হইতেছে।)

আমাদের সাধারণ চেতনাতে বিশ্বসংকল্প এমন এক বস্তু নয়, যাহা আপন স্বতন্ত্র শক্তি দ্বারা স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেছে ; ইহা কার্য্য করে ভূতসমূহের মধ্য দিয়া, জগতে ক্রিয়াশীল শক্তিরাজির মধ্য দিয়া এবং এই সমস্ত শক্তির বিধিবিধান ও তাহাদের পরিণামের মধ্য দিয়া—যখন আমরা নিজেকে উন্মুক্ত করিয়া সাধারণ চেতনার বাহিরে চলিয়া যাই, শুধু তখনই আমরা অনুভব করি যে ইহা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে

মাঝে আসিয়া পড়িতেছে এবং শক্তিচয়ের সাধারণ খেলাকে স্ববশে আনিতেছে।

তখন আমরা ইহাও দেখি যে শক্তিচয়ের বেলাতেও, তাহাদের বিকৃতি সত্ত্বেও বিশ্বসংকল্প কাজ করিতেছে পরিশেষে বিশ্বাতীত ভগবানের সংকল্প সিদ্ধ করিবে বলিয়া।

অতিমানস সিদ্ধিই হইল সেই বিশ্বাতীতের সংকল্প যাহা আমাদের ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ফুটাইয়া যে তুলিতে হইবে তাহা একটা অধস্তন চেতনার পরিবেশের মধ্যে, যেখানে বস্তুরাজি বিকৃত হইতে পারে আমাদের আপন অজ্ঞান দুর্ব্বলতা ও ভুলভ্রান্তির ফলে এবং বিরুদ্ধ শক্তিচয়ের সংঘাতের ফলে। এইজন্যই বিশ্বাস ও সমত্ব অপরিহার্য্য।

এই বিশ্বাস আমাদের থাকা চাই যে আমাদের অজ্ঞান অক্ষমতা ও বিভ্রম সত্ত্বেও, বিরুদ্ধ শক্তিরাজির আক্রমণ সত্ত্বেও বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতীয়মান ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ভাগবত সংকল্প আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থার মধ্য দিয়া চরম সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইতেছে। এই বিশ্বাসই আমাদিগকে আনিয়া দিবে সমভাব; ইহা এমন এক বিশ্বাস যাহা সকল ঘটনাবলীকেই মানিয়া লয় চলতি পথের আনুষঙ্গিক ব্যাপার বলিয়া, চরম নির্দ্দেশ বলিয়া নয়। একবার সমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সঙ্গে, তাহারই দ্বারা পুষ্ট, আর এক প্রকার বিশ্বাস বসিবে, যাহা অতিমানস চেতনা হইতে অবতারিত কোন শক্তির সাহায্যে সক্রিয় হইয়া উঠিবে, এবং বর্ত্তমান পরিবেশকে স্ববশে আনিয়া ভবিষ্যৎ ঘটনারাজি নির্দ্ধারিত করিবে, এবং বিশ্বাতীত ভগবানের সংকল্পসিদ্ধিকে এখানে নামাইয়া আনিবার সহায়তা করিবে।

যে-বিশ্বাস বিশ্বগত ভগবানের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার কার্য্যকরী শক্তি বিশ্বলীলার প্রয়োজন অনুসারে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে।

এই সব সীমাবন্ধন হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার নিমিত্ত বিশ্বাতীত ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

২৪-৬-৩১

ভগবানের ত্রয়ী সত্তা

বিশ্বাতীত, বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত ভগবানের মধ্যে প্রভেদ আমার দ্বারা আবিষ্কৃত নয় ; এই প্রভেদের উদ্ভব ভারতে বা এশিয়াখণ্ডে হয় নাই—বরঞ্চ ইহা ইউরোপায় শিক্ষা বলিয়াই পরিচিত, কাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত ; ভগবানের খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত ত্রয়ী মূর্ত্তি পিতা, পুত্র ও শুদ্ধ আত্মা, তাহারও মূলে রহিয়াছে এই প্রভেদ। ইউরোপের নিভৃত সাধকদিগের অনুভূতিতেও ইহা সুপরিচিত। ভগবান সর্ব্বব্যাপা এই বিশ্বাস যে যে আধ্যাত্মিক সাধনাতে আছে তাহাতেই মূলতঃ এই প্রভেদ রহিয়াছে—যেমন ভারতের বৈদান্তিক অনুভূতিতে, তেমনই মুসলমান যোগসাধনাতে (সুফী তথা অপর পন্থী) ইহাকে স্বীকার করা হয় ; মুসলমানেরা আবার শুধু দুইটা বা তিনটা ক্ষেত্রের কথা বলেন না, তাঁহাদের মতে পরমাত্মন্ স্তরে উঠিবার আগে ভগবানের বহু স্তর আছে। অপর কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল এই ধারণাটির বিষয়ে ভাবিলেও সহজেই মনে হইবে যে ব্যক্তিতত্ত্ব দেশকালগত বিশ্বতত্ত্ব এবং বর্ত্তমান বিশ্বধারার (বা অপর কোন বিশ্বধারার) পরপারে অবস্থিত তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য একটা থাকিতেই হইবে। অনেকেই আপন ব্যক্তিগত চেতনা হইতে স্বরূপে ও ক্রিয়াতে বিভিন্ন একটা সর্ব্বব্যাপী বিশ্বগত চেতনা অনুভব করে, আর যদি এই বিশ্বগতকে অতিক্রম করিয়া আর একটা চেতনা থাকে, যাহা শুধু কালগত নয়, যাহা অসীম ও মূলতঃ শাশ্বত, তাহা হইলে সে-বস্তু অপর দুইটি

চেতনা হইতে বিভিন্ন নিশ্চয়ই হইবে। আর ভগবান যদি এই তিন চেতনাতে থাকেন বা প্রকট হন তাহা হইলে একথা কি ভাবনীয় নয় যে ভাবে ও ক্রিয়াধারাতে তিনি নিজের মধ্যে এতটা পার্থক্য আনিতে পারেন যাহার দরুন আমাদের বাধ্য হইয়া ভগবানের তিন প্রকার ভাবের কথা বলিতে হয়, যদি না আমরা অনুভূতির সত্য সম্বন্ধে গণ্ডগোল বাধাইতে না চাই, যদি না আমরা একটা অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের শুধু নিষ্ক্রিয় অনুভূতিতে আবদ্ধ থাকিতে চাই ?

যোগসাধনাতে এই তিন প্রকার উপলব্ধির কার্য্যতঃ উপযোগ করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। যদি আমি ভগবানকে শুধু তৎ বা সেই বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করি, আমার ব্যক্তিগত আত্মন্ বলিয়া নয়, অথচ যাহা নিগূঢ়ভাবে আমার সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে চালিত করিতেছে এবং আমি আবরণের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিতে পারি—অথবা যদি আমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই ভগবানের মূর্ত্তিকে গড়িয়া তুলি—তাহা হইলে আমার একটা উপলব্ধি হইল বটে, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ। যদি আমি বিশ্বগত ভগবানকে উপলব্ধি করি, সমস্ত ব্যক্তিগত সত্তাকে তাহার মধ্যে ডুবাইয়া দেই, তাহা হইলে একটা খুব বৃহৎ উপলব্ধি পাইলাম বটে, কিন্তু আমি নিজে হইয়া গেলাম সার্ব্বভৌম শক্তির একটা আধার মাত্র, আমার আর কোন ব্যক্তিগত দিব্য পরিণতির সম্ভাবনা রহিল না। (যদি আমি শুদ্ধ বিশ্বাতীত সিদ্ধিতে দ্রুত উঠিয়া যাই, তাহা হইলে আমি নিরপেক্ষ বিশ্বাতীত তত্ত্বে নিমগ্ন হইয়া নিজেকেও হারাইলাম, বিশ্বকেও হারাইলাম।) অপর পক্ষে, যদি ইহাদের কোনটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য না হয়,

যদি আমি এই বিশ্বে ভগবানকে সিদ্ধ করিতে, প্রকট করিতে চাই, এবং সেই উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি অপ্রকট কোন শক্তিকে (যথা অতিমানস শক্তি) নামাইয়া আনিতে চাই, তাহা হইলে এই তিনটী বিভিন্ন উপলব্ধির সঙ্গতিসাধন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। অব্যক্ত শক্তিটীকে আমার নামাইয়া আনিতে হইবে, কিন্তু কোথা হইতে আনিব (সে শক্তি ত আজও বিশ্বধারাতে প্রকট হয় নাই) যদি না তাহাকে আনি অব্যক্ত পরাৎপর তত্ত্ব হইতে, যে-তত্ত্বে আমার পৌঁছিতে হইবে, যে-তত্ত্বকে আমার ব্যক্ত করিতে হইবে! (ইহাকে নামাইয়া আনিতে হইবে বিশ্বধারাতে; তাহা যদি হয় ত আমার বিশ্বগত ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইবে, বিশ্বপুরুষ ও বিশ্বশক্তিরাজি সম্বন্ধে আমাকে সচেতন হইতে হইবে। কিন্তু শুধু তাহাই ত নয়, বিশ্বগত ভগবানকে আমার মূর্ত্ত করিতে হইবে ইহলোকে---নতুবা উহা থাকিবে কেবল একটা প্রভাবরূপে, জড়জগতে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ বস্তুরূপে নয়; এ কার্য্য করা সম্ভব কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভগবানের মধ্য দিয়া।

আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্যে এইগুলিই হইল সক্রিয় বস্তু; যদি দিব্য কার্য্য করিতে হয় ত ইহারা অপরিহার্য্য।)

১২-৬-৩২

কয়েকটি আধ্যাত্মিক সমস্যা

তোমার চিঠিতে তুমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ তাহার ভাষা এমন বাঁধাধরা যে জীবনের ঘটনাবলীতে ও শক্তিচয়ে যে নমনীয়তা আছে তাহাকে তুমি হিসাবের মধ্যে আন নাই বলিযা মনে হইতেছে। প্রশ্নটি শোনায় খুব আধুনিক জড়বিজ্ঞানের মতবাদ-সংক্রান্ত সমস্যার মত—যদি জগতে সমস্ত কিছু প্রটন ও ইলেক্ট্রন নামক বৈদ্যুতীশক্তিকণা দিয়া রচিত হয়, যদি প্রত্যেকটি কণা ঠিক অপর কণাটির মতই হয়, (শুধু বিভিন্ন পদার্থে কণাব সংখ্যা বিভিন্ন), তাহা হইলে শুধু সংখ্যাভেদে এতটা গুণভেদ কেন হইবে, কোন প্রভেদই বা হইবে কেন, তাহাদের ক্রিয়াব ফলেই বা এমন বিশাল পার্থক্য কেন হইবে—পরিমাণ, প্রকার ও শক্তিব পার্থক্য? কিন্তু আমরা একথাই বা কি জন্য ধবিয়া লইব যে চৈত্য বীজসমূহ বা স্ফুলিঙ্গবাজি সবগুলি তাহাদের দৌড় আরম্ভ করিযাছিল একই সময়ে, একই অবস্থাতে, একই শক্তি ও একই স্বরূপ লইয়া? ধরিয়া লওয়া যাক যে এক অদ্বিতীয় ভগবান সবকিছুব উৎস এবং সবার অন্তরে একই পুরুষ বিরাজিত; কিন্তু বিশ্বভুবনে অসীম তত্ত্ব অসীম বৈচিত্র্যে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করিবেন না কেন, অসংখ্য কিন্তু অভিন্ন এক প্রকারে কেন প্রক্ষিপ্ত করিবেন? এই চৈত্য বীজসমূহের কতগুলি অপরগুলির অনেক আগে যাত্রারম্ভ করিয়াছিল, কতগুলির পশ্চাতে পরিণতির একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, আবার কতগুলি অল্পদিনের জিনিষ মাত্র, অপক্ক ও

অর্দ্ধঅঙ্কুরিত? আবার, এমন হইবে না কেন যে যাহারা একসঙ্গে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও কতগুলি খুব বেগে দৌড় দিয়াছে এবং বাকীগুলি মন্থরগতিতে চলিয়াছে, অতিকষ্টে বৃদ্ধি পাইয়াছে, চক্রাকারে ঘুরিয়াছে? তারপর একটা ক্রমবিকাশ আছে যাহার একটা স্তরে ইতর প্রাণীর পরিণতি শেষ হইয়া মানবের পরিণতি আরম্ভ হইল; মানবজীবনের আরম্ভ, যাহা একটা বিশাল বিবর্ত্তন বা বিপ্লব, তাহার স্বরূপ কি? জীবজন্তুর সীমান্তরেখা পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি দেহের ও প্রাণের —মানবজীবনের সূত্রপাতের জন্য ইহা কি প্রয়োজনীয় নয় যে মনোময় সত্তা অবতীর্ণ হইয়া দেহপ্রাণময়ের ক্রমপরিণতির ভার তুলিয়া লইবে? আর, এরূপ কি হইতে পারে না যে এইসমস্ত মনোময় সত্তা, যাহারা নামিয়া আসে, তাহারা সবাই শক্তিতে ও পদবীতে সমান নয়, এবং সমান পরিণত দেহপ্রাণময় চেতনাতে অবতীর্ণ হয় না? আবার এরূপ একটা ঐতিহ্য আছে সূক্ষ্ম অতিভৌতিক সত্তাগণের যাহারা বর্ত্তমান ভুবনের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান রহেন এবং তাহার মধ্যে নামিয়া আসিয়া নানা উচচ-নীচ স্থান অধিকার করিয়া বসেন,—এমন কি, মানব-প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ্বলীলায় যোগদান করেন। এ সমস্ত ব্যাপারে নানা জটিলতা রহিয়াছে, সমস্যাটিকে গণিতের সূত্রের মত বাঁধাধরা রূপে উপস্থাপিত করা যায় না।

এই সমস্ত সমস্যার জটিলতা, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে যেসব দুর্ব্বোধ্য অসঙ্গতি দেখা দেয়, তাহা অনেক সময়ে উত্থিত হয় সমস্যা যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় না বলিয়া। জন্মান্তর ও কর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ বিবৃতির বিচার করিলে দেখা যায় যে উহার মূলে রহিয়াছে শুধু

এই মানস ধারণা যে প্রকৃতির ক্রিয়াবলী. হওয়া উচিত সুনীতিসঙ্গত, অর্থাৎ তাহাদের চলা চাই একেবারে পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে—দণ্ড ও পুরস্কারের অমোঘ অটল বিধান অনুসারে, অথবা অন্ততঃ, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের মানুষী কল্পনা অনুযায়ী ফলাফলের বিধান অনুসারে। কিন্তু প্রকৃতিদেবীর সহিত ত নীতিবোধের কোন সম্বন্ধ নাই—তিনি স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত সুনীতিসঙ্গত, দুর্নীতিসঙ্গত, নীতিবহির্ভূত, সকল প্রকার শক্তির ও প্রণালীর যথেচ্ছ উপযোগ করেন। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যেন তিনি এক কার্য্যসিদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুর খেয়ালই করেন না—অথবা হয়ত কেবল জীবনলীলাতে একটা সুনিপুণ বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াই তুষ্ট হন।(ভিতরে গভীরে দেখিলে বোঝা যায় যে প্রকৃতি একটা সচেতন আধ্যাত্মিক শক্তি, তিনি সদা ব্যাপৃত তাঁহার চালনাধীন আত্মাসমূহের অভিজ্ঞতাবলে ক্রমবর্দ্ধন ও তাহাদের আধ্যাত্মিক পরিণতি লইয়া এবং এইসব আত্মারও আপন পরিণতি সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সংসারের ভালমানুষেরা দুঃখ করেন এবং আশ্চর্য্য হন যে তাঁহারা ও তাঁহাদের মত অন্য ভালমানুষরা বিনা কারণে ও নিরর্থকভাবে এত কষ্টতাপ ও দুর্দ্দৈবের কবলে পড়েন। কিন্তু সত্যই কি একটা বাহিরের শক্তি, একটা কর্ম্মের যান্ত্রিক বিধান এই সমস্ত দুঃখকষ্ট তাঁহাদের উপর আরোপিত করেন?) এমন কি হইতে পারে না যে আত্মা নিজে—বাহ্য মন নয়, অন্তরস্থ পুরুষ—এই সমস্ত অপ্রিয় ব্যাপারকে পছন্দ করিয়া, স্বীকার করিয়া লইয়াছেন আপন পরিণতির অঙ্গস্বরূপ, আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতাসমূহ দ্রুত সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত,—কাটিয়া পথ করিতে হয় ত তাহাও করিবেন বলিয়া, তাহাতে যদি বাহ্য দেহ প্রাণের বহুল ক্ষতি

হয় ত সেজন্যও প্রস্তুত হইয়া ? ক্রমবর্দ্ধমান আত্মার কাছে, অন্তরস্থ পুরু-ষের কাছে বাধা বিপত্তি, বাহিরের আক্রমণ, এসব কি বিবৃদ্ধিব অধিকতর সামর্থ্যের, বৃহত্তর অনুভূতির আধ্যাত্মিক জয়লাভের শিক্ষার উপায় হইতে পারে না ? এই সংসার পার্থিব বস্তুরাজির ব্যবস্থা টাকা-আনা-পাইয়ের ব্যবস্থা না হইয়া পুবস্কার-বিতরণ ও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা না হইয়া, এইরূপই ত হইতে পাবে !

তোমার বন্ধুব পত্রে বিবৃত পরিবেষ্টনে পশুবধের সমস্যা সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়। তিনি সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযুজ্য একটা অটল নীতি-সম্মত ন্যায়ান্যায়-বোধকে ভিত্তি করিয়া সমস্যার বিচাব কবিয়াছেন—যে-কোন পবিবেশে হোক, পশুবধ কি আদৌ ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হইতে পারে, কোন পশুকে তোমার চক্ষের সম্মুখে কি যাতনাভোগ করিতে দেওয়া উচিত, যখন তুমি তাহাকে শাস্তি দিতে পার কৃত্রিম উপায়ে বিনা বেদনায় তাহার প্রাণনাশ করিয়া ? এরূপভাবে উপস্থাপিত প্রশ্নের কোন নিসংশয় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, এইজন্য যে উত্তর নির্ভর করিতেছে এমন সব বস্তুর উপব যাহা বর্ত্তমানে মানবমনের সম্মুখে নাই। অপর নানা কারণ আছে যাহার বশে মানুষ এই দ্রুত ও দয়া-প্রেরিত উপায়ে বিপদ্-মুক্ত হইতে চায় ; হয়ত এতটা যাতনা-ভোগ চক্ষে দেখিতে ও কানে শুনিতে পারে না, এতটা কষ্ট এতটা বিতৃষ্ণা এতটা অসুবিধা বৃথা সহিতে চায় না, সেইজন্য ধরিয়া লয় যে জন্তুটিও যেমন করিয়া হোক বেদনার কবল হইতে পলাইতে চায় ! কিন্তু বস্তুতঃ ইতর প্রাণীটি নিজে কি ভাবিতেছে, সে কি ব্যথাবেদনা সত্ত্বেও জীবনটাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে চায় না ? আত্মা কি এই সমস্ত যাতনা ভোগকে মানিয়া

লয় নাই, ইহারা উচচতর জীবিতাবস্থাতে অবিলম্বে লইয়া যাইবে বলিয়া ? এরূপ যদি হয়, তাহা হইলে তুমি করুণাবশে যাহা করিতে চাও তাহা এই প্রাণীর কর্ম্মের গতিবিধি উলটপালট করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যাপারে তোমার কর্ত্তব্য বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, তাহা নির্ভর করিতে পারে এমন জ্ঞানের উপর যাহা তোমার মনের অগোচর,— আবার এরূপ ত হইতেই পারে যে সেই জ্ঞান উদয় হওয়া পর্য্যন্ত তোমার প্রাণনাশ করিবার কোন অধিকারই নাই। এই সত্যের একটা অস্পষ্ট বোধবশেই ধর্ম্ম ও সুনীতি একটা অহিংসার বিধান বাঁধিয়া দিয়াছে, আবার উহাও কালে হইয়া দাঁড়ায় কার্য্যতঃ অপ্রযুজ্য একটা মানস বিধি। এসব ব্যাপার হইতে আমরা হয়ত এই শিক্ষা পাই যে (প্রত্যেক ঘটনাতে পরিবেশ অনুসারে বুদ্ধির চালনাতে আমরা কাজ করিব ; কিন্তু সমস্যাবলীর চরম নিষ্পত্তি আসিতে পারে শুধু যদি আমরা একটা শ্রেষ্ঠতর চেতনার, একটা শ্রেষ্ঠতর চালনার দিকে অগ্রসর হই, যেখানে এই সব সমস্যা উঠিবেই না যেভাবে মানুষের মন তাহাদিগকে দেখে, কেন না আমরা তখন এমন একটা দৃষ্টি পাইব যাহা জগৎকে অন্যভাবে দেখিবে, এমন একটা চালনা পাইব যাহা এখন আমাদের লভ্য নয়) মানস বা সুনীতি-প্রণোদিত নিয়মাবলী সাময়িক বিধান মাত্র ; মানুষের তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হয় অনিশ্চিতভাবে, নানা পদস্খলনের মাঝে, যতদিন না সে বস্তুরাজিকে সমগ্ররূপে দেখিতে পায় আত্মার জ্যোতিতে।

২৯-৬-৩২

পুনর্জন্ম ও ব্যক্তিত্ব

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে একটা সাধারণ ভ্রম এড়াইয়া চলা একান্ত আবশ্যক। মানুষের সাধারণ ধারণা হইল কতকটা এই প্রকার :—ধর, যেন, একজন রোমক, Ballus-নামা, মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম লইল ইংলণ্ডে Smith নামে ; পূর্ব্বজীবনে তাহার যে ব্যক্তিগত স্বরূপ, স্বভাব, বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, এবারেও তাহাই, প্রভেদ শুধু এইটুকু যে আগে সে পরিত টোগা, এখন পরে কোট-পাৎলুন, আগে সে কথাবার্ত্তা কহিত চলতি লাতিন-এ এখন সে কহে লণ্ডনের ইংরেজী বুলিতে। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ ত হয় না। কালের আরম্ভ হইতে অন্ত অবধি লক্ষ লক্ষ জন্মে একই স্বরূপ, একই স্বভাবের পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ কি ? আত্মা যে বারবার জন্ম-পরিগ্রহ করে, তাহা অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্ত, বৃদ্ধির নিমিত্ত, ক্রমবিকাশের নিমিত্ত, যতদিন না জড় আধারে ভগবান প্রকট হন। মানুষের মূল সত্তাই বারবার জন্ম লয়, তাহার বাহিরের সত্তা নয় ; বাহ্যসত্তারূপ একটা আধার সে গড়িয়া লয় তন্মধ্যে সেই একটি জীবনের অভিজ্ঞতা-রাজি মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে বলিয়া। মূল সত্তা আর এক জন্মে আর একটি ব্যক্তিস্বরূপ গড়িয়া লইবে, তাহার শক্তিসামর্থ্য ও জীবনধারা অন্য-প্রকার হইবে। ধর যেন, রোমক মহাকবি Virgil আবার জন্ম লইলেন ; হয়ত পরবর্ত্তী দুই এক জীবন তিনি কবিতা লিখিবেন,—কবিতা লিখিবেন বটে, কিন্তু মহাকাব্য রচনা করিবেন না, রচনা করিবেন সুন্দর সরস ছোট ছোট খণ্ড কবিতা যাহা তিনি তাঁহার রোমক জন্মে

লিখিতে খুবই চাহিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই। আর এক জন্মে হয়ত তিনি আদৌ কবি হইবেন না, হইবেন দার্শনিক ও যোগী, চেষ্টা করিবেন পরমসত্যকে প্রাপ্ত হইতে ও প্রকট করিতে, যেদিকে তাঁহার একটা ব্যর্থ ঝোঁক ছিল রোমের জীবনে। কিংবা হয়ত মহাকবি Virgil-রূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বের জীবনে তিনি ইনিয়াস বা অগষ্টেসের মত যোদ্ধা কি সম্রাট হইয়া কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এইভাবে, হয় এদিকে নয় ওদিকে, মূলসত্তা নূতন নূতন স্বভাব ও স্বরূপ ফুটাইয়া তোলে, পরিণত হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নানা পার্থিব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। বিবর্ত্তমান সত্তা যখন আরও বেশী পরিণত হয়, আবও বেশী সমৃদ্ধ ও জটিল হইয়া উঠে তখন সে (মনে হয় যেন) তাহার জন্মজন্মান্তরের ব্যক্তিস্বরূপ সব একত্র সন্নিবদ্ধ করে। তাহারা কখনও বা জীবনের ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহেব পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এখানে-সেখানে একটা কোন বর্ণ, একটা কোন গুণ বা একটা কোন শক্তি নিক্ষিপ্ত করে,—আবার কখনও হয়ত সম্মুখে বাহির হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ফলে আসে একটা সমবেত ব্যক্তিত্ব, একটা বহুমুখী স্বভাব বা সামর্থ্য, যাহা কখন কখন দেখায় যেন একটা বিশ্বব্যাপী সামর্থ্যের মত। কিন্তু যদি একটা প্রাক্তন ব্যক্তিত্ব কি প্রাক্তন সামর্থ্যকে পুবোপুরি সম্মুখে আনা হয়, তাহা হইলে সেই আনয়নের উদ্দেশ্য হইবে না পূর্ব্বকৃত কার্য্যের পুনরাবৃত্তি,—উদ্দেশ্য হইবে সেই সামর্থ্যকে নূতন রূপ ও নূতন আকৃতিতে নিক্ষেপ, এবং তাহার দ্বারা সত্তার এমন একটা অভিনব সঙ্গতিসাধন যাহা পূর্ব্বতনের পুনরাবৃত্তি নয়। অতএব তোমার পূর্ব্বজন্মের যোদ্ধা বা কবি যাহা ছিলেন, তুমি তাহাই হইবে এরূপ আশা করা চলিবে না ; আগের বারের

কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে বটে, কিন্তু সেগুলি দেখা যাইবে বহুল পরিবর্ত্তিত এবং নূতন ছাঁচে নূতন ভাবে সজ্জিত, তোমার শক্তি-সামর্থ্য অকৃতপূর্ব্ব কার্য্যের সম্পাদনে অভিনব মার্গে ধাবিত হইবে।

আর এক কথা। পুনর্জন্মের ব্যক্তিস্বরূপ ও স্বভাবই মুখ্যবস্তু নয়,—মুখ্যবস্তু হইল তোমার প্রকৃতির পশ্চাতে দণ্ডায়মান চৈত্যপুরুষ, যিনি তোমার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। এই চৈত্য-সত্তা যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া, মনপ্রাণকেও ত্যাগ করিয়া আপন বিশ্রামভূমির দিকে চলিয়া যান, তখন তিনি সঙ্গে লইয়া যান তাঁহার অনুভূতি-অভিজ্ঞতারাজির সারাংশকে—ভৌতিক ঘটনাচয়কে নয়, প্রাণের গতিবিধিকে নয়, মনের রূপরচনাবলীকে নয়, স্বভাব-সামর্থ্যকে নয়, সঙ্গে লন এই সমস্তের মধ্য হইতে যে সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়াছে তাহাকে, যাহাকে বলা যায় সেই দিব্যবস্তু যাহার জন্য অপর সমস্তকিছু আসিয়াছিল। এই বস্তুই হইল চিরন্তন সঞ্চয়, ইহাই ভগবানের পানে সত্তার বিবৃদ্ধির সহায়তা করে। এই কারণেই সাধারণতঃ পূর্ব্বজীবনের বাহ্য ঘটনাবলী ও পরিবেষ্টন স্মরণ থাকে না: এই স্মৃতির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা হইল মনের, প্রাণের, এমন কি সূক্ষ্মদেহের নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়ার একটা প্রচণ্ড পরিণতি; কেন না মানুষের অস্ফুট বীজ-স্মৃতির মধ্যে সমস্তটা সঞ্চিত থাকিলেও তাহা ত সাধারণতঃ বাহিরে প্রকট হয় না! আগের জন্মের যোদ্ধার মহিমার মধ্যে যে দিব্য উপাদান ছিল, যাহা তাঁহার নিষ্ঠা, ঔদার্য্য ও শৌর্য্যবীর্য্যে ব্যক্ত হইয়াছিল,—কবির মনের সুসঙ্গতি ও প্রাণের

মহত্ত্বের পশ্চাতে যে দিব্যবস্তু প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা তাঁহার মনপ্রাণের ক্রিয়াতে প্রকাশ হইয়াছিল,—তাহা থাকিয়া যায় এবং স্বভাবের একটা নবীন সুসঙ্গতির মধ্যে নূতন অভিব্যক্তি লাভ করে, অথবা যদি জীবন ভগবদভিমুখী হয় তাহা হইলে সিদ্ধির নিমিত্ত অথবা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে করণীয় কার্য্যের নিমিত্ত তাহা শক্তিসামর্থ্যরূপে গৃহীত হয়।

১৭-৬-৩৩

এই বিশ্বের প্রহেলিকা

ইহা অস্বীকার করা যায় না, কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতিই অস্বীকার করিবে না, যে এই জগৎ একটা আদর্শস্বরূপ স্থান নয়, ইহা মানুষকে তুষ্টি দিতে পারে না, ইহার উপব অপূর্ণতা অশিব ও দুঃখভোগের একটা গভীর ছাপ পড়িয়াছে। বস্তুতঃ একদিক দিয়া এই বোধই আধ্যাত্মিক প্রেরণার আরম্ভ—তবে অল্পসংখ্যক কয়েক জন আছে যাহাদের অন্তরে মহত্তর অনুভূতি আপন হইতেই আসে, প্রকট ভুবনের সমস্তটার উপরে যে অন্ধকার ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে তাহার প্রবল দুর্দ্ধর্ষ দুঃখকর বৈরাগ্য-কব বোধের দ্বারা বাধ্য না হইয়াই আসে। তথাপি এ প্রশ্ন রহিয়াই যায় যে সত্যই কি (লোকে যেমন বলে) এই হইল বিশ্বভুবনের মূল স্বরূপ ; অন্ততঃ যতদিন একটা জড়বিশ্ব আছে ততদিন তাহা এইরূপ হইতেই হইবে, অতএব জন্মপরিগ্রহের কামনা, প্রকট হইবার ইচ্ছা ও সৃষ্টি কবিবার আকাঙ্ক্ষাকে আদিম পাপ বলিয়া দেখিতেই হইবে এবং জন্ম ও প্রপঞ্চ হইতে বাহির হইয়া যাওয়াকেই লইতে হইবে মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া। যাহারা জগৎকে এই দৃষ্টিতে বা এইপ্রকার কোন দৃষ্টিতে দেখে (এইরূপ লোকেরই সংখ্যা চিরকাল বেশী) তাহাদের বাহির হইয়া যাইবার নানা সুপরিচিত উপায় আছে, আধ্যাত্মিক মুক্তির সরাসরি সব পথ আছে। কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপার এবংবিধ নাও হইতে পারে, হয়ত আমাদের অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানের কাছে এইপ্রকার বোধ হয় মাত্র,—অপূর্ণতা, অশিব, শোকতাপ, এসব কেবল প্রতিকূল পরিবেশ,

চলতি পথের সাময়িক দুঃখ হইতে পারে—বিশ্বভুবনের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার বা সংসারে জন্মপরিগ্রহের সারবস্তু নাও হইতে পারে। যদি না হয় তাহা হইলে পলায়ন-বৃত্তিই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের পরিচায়ক হইবে না, ইহজগতে বিজয়লাভের প্রয়াসই হইবে বুদ্ধিমানের কাজ—বিশ্বের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন পরম সংকল্পের সহিত একযোগে প্রয়াস, নিখুঁত পূর্ণতার একটা আধ্যাত্মিক প্রবেশ-তোরণের সন্ধান করিবার প্রয়াস, যে-তোরণ হইবে দিব্য জ্যোতি, জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের পূর্ণ অবতরণের পথ।

সকল আধ্যাত্মিক অনুভূতিই আমাদিগকে বলে যে একটা নিত্য শাশ্বত তত্ত্ব আছে আমাদের আবাস-ভূমি এই প্রকট বিশ্বের অনিত্যতার পরপারে, এই সসীম চেতনার ঊর্দ্ধে, যাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আমরা অনেক হাঁকুপাকু করিয়া অনিশ্চিত পদে চলাফেরা করি। সেই নিত্য-বস্তু স্বতঃঅসীম, মুক্ত, স্বয়ম্ভূ,—নিরপেক্ষ জ্যোতি ও নিরপেক্ষ আনন্দ-স্বরূপ। এই যে দুই জীবন ইহলোকের অনিত্য জীবন এবং পরপারের শাশ্বত জীবন—ইহাদের মাঝখানে কি একটা একেবারে অলঙ্ঘ্য গহ্বর আছে, না ইহারা চিরদিনই জীবনের দুই বিপরীত প্রান্ত এবং মানুষ কালের সসীম গণ্ডীর মাঝে পরিভ্রমণ ছাড়িয়া দিলে পরে তখন সে এক লাফে মধ্যবর্ত্তী গহ্বর পার হইয়া অসীম অনন্তে পৌঁছিতে পারে? এইটিই, মনে হয় যেন, এক শ্রেণীর অনুভূতির শেষ প্রান্ত, যাহাকে বৌদ্ধদর্শন চরম সিদ্ধান্ত অবধি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিয়াছে; এক প্রকারের অদ্বৈত-বাদও এই পথ ধরিয়াছে বটে, তবে বৌদ্ধদের মত অতটা অটল দৃঢ়-ভাবে নয়, কেন না তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের সম্বন্ধ অংশতঃ

স্বীকৃত হইয়াছে,—তবে স্বীকৃত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত দুই তত্ত্বের মধ্যে সত্য-ধ্রুব ও অসত্য-অলীক বলিয়া প্রভেদও রাখা হইয়াছে। কিন্তু অপর এক প্রকারের নিঃসংশয় অনুভূতিও আছে যে জগতে সব কিছুর মধ্যে, সবকিছুর ঊর্দ্ধ্বে ও সবকিছুর পশ্চাতে ভগবান রহিয়াছেন, এবং আমরা বাহ্যরূপ হইতে আন্তর সত্যে প্রবেশ করিলেই বুঝিতে পারি যে প্রকট বস্তুরাজি সবই সেই এক পবম তত্ত্বের সহিত অভিন্ন এবং তাহারই মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটা অত্যুজ্জ্বল ও অর্থপূর্ণ সত্য যে যেজন ব্রহ্মকে জানিয়াছে সে জগতে বিচবণ করিতে কবিতে, কর্ম্ম কবিতে করিতে, জগতেব সকল সংঘাত সহ্য কবিতে করিতেও ভগবানেব পবম শান্তি জ্যোতি ও আনন্দেব মাঝে বাস করিতে পারে। তাহা হইলে এখানে তীব্র বিবোধ ছাড়াও আর একটা কিছু আছে,—একটা বহস্য, একটা সমস্যা —যাহার সমাধান একেবারে মবিযা না হইয়াও কবিতে পাবা যায়। এই যে আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা, ইহা নিজেকে অতিক্রম কবিযা যায, এবং আমাদের এই পতিত জীবনের অন্ধকাবেব মাঝে একটা আশার কিরণ লইয়া আসে।

একটা প্রশ্ন এখানে সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হয়—এই জগৎ কি তবে সর্ব্বদা একই ঘটনাবলীর নিরবচ্ছিন্ন পবম্পরা, না ইহার মধ্যে একটা ক্রমপবিণতির প্রেরণা আছে, ইহা বস্তুতঃ ক্রমবিকাশের একটা ধারা, ঊর্দ্ধ্বগমনের একটা সোপান—মূল প্রতীয়মান নিশ্চেতনা হইতে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ অধিক পরিণত চেতনাতে উত্থান, প্রত্যেক ধাপ হইতে আরও উচ্চে আরোহণ যতক্ষণ না প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই উচ্চতম শৃঙ্গ-রাজি যাহা আজিও সাধারণ শক্তির অগম্য। যদি এরূপ হয়, তাহা

হইলে সেই ক্রমোত্তরণের অর্থ কি, মূল তত্ত্ব কি, তাহার যুক্তিসম্মত পরিণাম কি? মনে হয় যেন সব কিছু নির্দ্দেশ করিতেছে যে জগতে বাস্তবিক একটা অগ্রগতি চলিয়াছে—একটা ক্রমবিকাশ, শুধু ভৌতিক নয়, একটা অতিভৌতিক বিকাশও। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিরও একটা ধারা আছে যাহা এই ক্রমবিকাশের সহিত সমঞ্জস, যাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে মূলে যে-নিশ্চেতনা আছে তাহা প্রতীয়মান মাত্র, কেন না তাহার মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে এক দিব্য চৈতন্য যাহার পরিণতির সম্ভাবনা অপার, এমন এক চৈতন্য যাহাব সীমা নাই, যাহা সর্ব্বব্যাপী ও অসীম, একটা প্রচ্ছন্ন ও স্বেচ্ছাবরুদ্ধ ভাগবত তত্ত্ব,—জড় পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু যাহার গভীরে লুক্কায়িত রহিয়াছে সর্ব্বপ্রকার পরিণতির সম্ভাবনা। এই প্রতীয়মান নিশ্চেতনার মধ্য হইতে একটার পর একটা পবিণতি ক্ষমতা প্রকট হয়,—প্রথমে সংগঠিত হয় জড়দ্রব্য, তাহার অন্তরে বিরাজিত প্রচ্ছন্ন দিব্যসত্তা—তারপর প্রাণশক্তি উদ্ভিদে জাগ্রত হইয়া প্রাণীতে একটা ক্রমবর্দ্ধমান মনোবৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়াছে,—পরিশেষে এই মনোবৃত্তি পরিণত ও ব্যবস্থিত হইয়াছে মানবসত্তাতে। এই ক্রমপরিণতি, এই আধ্যাত্মিক প্রগতি, ইহা কি এখানে এই মানবনামা মনোময় জীবে নামিয়া যাইবে, না ইহার রহস্য শুধু একটা জন্ম-জন্মান্তর পরম্পরা যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও পরিণাম হইল সেই স্তর অবধি অগ্রসর হওয়া যেখানে ইহা নিজের ব্যর্থতা উপলব্ধি করতঃ নিজেকে পরিহার করিতে পারিবে এবং কোন মূল অজাত সৎ বা অসৎ তত্ত্বে ঝাঁপ দিতে পারিবে? একটা সম্ভাবনা অন্ততঃ আছে, যাহা পরবর্ত্তী কোন স্তরে ধ্রুব বাস্তবে পরিণত হয়, যে আমরা যাহাকে মন বলি তদপেক্ষা

একটা অনেক বড় চেতনা আছে এবং আরও উর্দ্ধে উঠিলে আমরা এমন এক স্থান প্রাপ্ত হইতে পারি যেখানে জড়ের নিশ্চেতনা ও মনপ্রাণগত অজ্ঞানের প্রভাব আর আদৌ থাকে না ; এমন একটা চেতনা সেখানে প্রকট হইতে পারে যাহা অবরুদ্ধ ভাগবত তত্ত্বকে মুক্ত করিবে আংশিক ও অপূর্ণভাবে নয়, আমূল ও সমগ্র ভাবে। এই দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তর, মনে হয় যেন, চেতনার উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির অবতরণের ফল, যে অবতরণ পার্থিব ক্ষেত্রকে উর্দ্ধে উঠাইতেছে, একটা নূতন স্তর সৃষ্টি করিতেছে,—কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরগুলি এখনও অবতীর্ণ হয় নাই এবং তাহাদের অবতরণের দ্বারাই পার্থিব জীবনের সমস্যার সমাধান হইবে, এবং শুধু আত্মা নয় স্বয়ং প্রকৃতির বন্ধনমোচন হইবে। ইহাই হইল সেই পরম সত্য যাহা প্রথমে ক্ষণিক চমকরূপে দৃষ্ট হইলেও ক্রমশঃ অধিক পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয়, সেই সূক্ষ্মদর্শীদের দ্বারা যাহাদিগকে তন্ত্র বলিয়াছে বীর সাধক ও দিব্যসাধক,—সেই সত্য যাহা পূর্ণ অভিব্যক্তি ও পূর্ণ অনুভূতির জন্য প্রায় প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে। তাহা হইলে জগতে দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও অন্ধকারের বোঝা যতই ভারী হউক না কেন যদি তাহার শ্রেষ্ঠ পরিণতিস্বরূপ এই সত্য আমাদের সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে, যে শক্তিমান ও সাহসী পুরুষ, সে কোন দুঃখকষ্ট ভোগকেই এই চরম গৌরবের অত্যধিক মূল্য মনে করিবে না। অন্ততঃ অন্ধকার ছায়া দূর হইয়াছে ; একটা দিব্য জ্যোতি পৃথিবীর উপরে তাহার আলোকপাত করিয়াছে, আর তাহার সুদূরের দুর্লভ দীপ্তি নাই।

সত্য বটে, এ সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই যে এই সব ভোগ যাহা আজও রহিয়াছে তাহার আবশ্যকতা কি—এই যে স্থূল ব্যাপারসমূহ

লইয়া যাত্রারম্ভ, এই যে সুদীর্ঘ ঝড়তুফানের পদ—এই যে এতদিন ধরিয়া এতটা নির্য্যাতন, এত অশিব, এত যাতনাভোগ, এসবের কি প্রয়োজন ছিল। মানুষের অজ্ঞানে পতনের যথার্থ কারণ (বা "কেন") সম্বন্ধে না হোক, সেই পতনের প্রকার (বা "কিরূপে") সম্বন্ধে সকল রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই মোটামুটি এক মত। ভাগ-বিভাগ, ভেদ-বিভেদ, শাশ্বত এক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া, এইসবের ফলেই মানুষের অজ্ঞানে পতন ঘটিয়াছে ; (মানুষের অহমিকা যে পৃথিবীতে নিজেকে পৃথকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং ভগবানের সহিত, তথা সর্ব্বভূতের সহিত একত্বের উপর জোর না দিয়া নিজের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর জোর দিতে লাগিল—তারপর সেই অহমিকা যে এক অদ্বিতীয় পরম দিব্য শক্তি, জ্ঞান, জ্যোতিকে সমস্ত খণ্ড খণ্ড শক্তির সঙ্গতি নির্দ্ধারিত করিতে না দিয়া প্রত্যেকটী কল্পনা, প্রত্যেকটী শক্তি ও প্রত্যেকটী বস্তুরূপকে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে (পরিশেষে অপরের সহিত সংঘর্ষের দ্বারা) অসীম অপার সম্ভাবনীয়তার মাঝে স্বতন্ত্রভাবে পরিণত হইতে দিতে লাগিল তাহারই ফলে আমরা অজ্ঞানে পতিত হইলাম) এই জগতের দুঃখভোগ ও অজ্ঞানের যথার্থ কারণ হইল একটা স্বতন্ত্র সত্তার ভেদবিভেদ, অহঙ্কার, অপূর্ণ চেতনা, অন্ধকারে হাতড়ান ও ঝুটোপুটি। একবার যেই চেতনারাজি এক অখণ্ড চেতনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, অমনই বাধ্য হইয়া তাহারা অজ্ঞানে পড়িল, আর এই অজ্ঞানের চরম পরিণাম হইল নিশ্চেতনা ; [একটা বিশাল অন্ধকার নিশ্চেতনার মধ্য হইতে উঠে এই জড়জগৎ এবং তাহার মধ্যে হইতে উঠে একটা আত্মা, যাহা প্রচ্ছন্ন পরম জ্যোতির দিকে আকৃষ্ট হইয়া

ক্রমবিকাশের ধারাতে চেতনার মধ্যে উঠিবার প্রয়াস করিতেছে,—উঠিতেছে (কিন্তু এখনও অন্ধভাবে) সেই হারান ভাগবত তত্ত্বের দিকে যাহা হইতে সে আসিয়াছিল।

কিন্তু এরকম হইলই বা কেন? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ও তাহার উত্তর দিবার একটা সাধারণ ধারা আছে যাহা আরম্ভেই বর্জন করিতে হইবে—মানুষী ধারা, তাহার সুনীতি-প্রণোদিত প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রোহ, তাহার ভাব-আবেগোম্বিত চীৎকার। কেন না এমন ত নয় (যেরূপ অনেক ধর্ম্মমত ধরিয়া লইয়াছে) যে একজন বিশ্বাতীত স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগত, দেবতা, যিনি স্বয়ং এই অজ্ঞানে পতনের একেবারে বাহিরে অধিষ্ঠিত তিনি আপন খেয়ালবশে সৃষ্ট জীবসমূহের উপর অশিব ও দুঃখ-কষ্ট চাপাইয়াছেন। আমরা যে ভগবানকে জানি, তিনি এক অপার অসীম সত্তা যাহার অনন্ত অভিব্যক্তিতে এই সমস্ত বস্তু আবির্ভূত হইয়াছে—ভগবান স্বয়ং এখানে রহিয়াছেন, আমাদের পশ্চাতে, তাঁহার অখণ্ড এক সত্তা সারা বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে, পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; আমাদের অন্তর্য্যামী ভগবানই পতনের বোঝা ও তাহার অন্ধকার পরিণাম-সমূহকে বহন করিতেছেন। যদি এরূপ হয় যে সেই ভগবান চিরদিন ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন তাঁহার পরিপূর্ণ শান্তি জ্যোতি ও আনন্দ লইয়া, তাহা হইলে তিনি এখানেও আছেন; তাঁহার শান্তি, জ্যোতি ও আনন্দ নিগূঢ়ভাবে সবকিছুকে ধরিয়া রহিয়াছে; আমাদের মধ্যেই আছেন এক আত্মা পুরুষ, এক মূলতত্ত্ব, যিনি তাঁহার বাহিরে প্রকট সত্তা-সমূহ হইতে অনেক বড়, যিনি, স্বয়ং পরমাত্মার মতই, আপন প্রতীক-সমূহের নিয়তির প্রভাবের বহির্ভূত। আমাদের অন্তরস্থ এই ভগবানকে

যদি আমরা খুঁজিয়া পাই, যদি আমরা নিজদিগকে এই তত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারি, (যে-তত্ত্ব সত্তাতে ও সারবস্তুতে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন), তাহা হইলে সেই হইল আমাদের মুক্তির তোরণ, এবং তাহার মধ্যে আমরা আমাদের যথার্থ মুক্ত, দীপ্ত ও আনন্দময় স্বরূপে বাস করিতে পারি বিশ্বের বিরোধ-অসঙ্গতি সত্ত্বেও। ইহাই হইল আধ্যাত্মিক অনুভূতির চিরন্তন সাক্ষ্য।) কিন্তু তথাপি বিরোধ-অসঙ্গতির উদ্দেশ্য কি, আদিকারণ কি,—কেন আসিল এই অহমিকা, এই ভাগ-বিভাগ, এই কষ্টকর ক্রমপরিণতির জগৎ? ভাগবত আনন্দ, শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে দুঃখতাপ ও অমঙ্গল প্রবেশ করিবে কেন? মানুষী বুদ্ধিকে তাহার আপন স্তরে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কেন না এই ব্যাপারের আরম্ভ যে-চেতনার অন্তর্গত, যে-চেতনার কাছে ইহা বুদ্ধির অতীত জ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ, তাহা বিশ্বগত চেতনা, ব্যক্তিগত মানবের চেতনা নয়, মানুষী যুক্তিবুদ্ধি ও মানুষী অনুভব অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রচয়ে ইহা দেখে, ইহার দৃষ্টি ও বোধ মানবের দৃষ্টি ও বোধ হইতে বিভিন্ন, ইহার চেতনাধারাই অন্যরূপ। মানব-মনের কাছে এই জবাব দেওয়া যাইতে পারে যে অনন্ত ভগবান এই সমস্ত বিক্ষোভের বশবর্ত্তী না হইতে পারেন, কিন্তু একবার যখন তাঁহার অভি-ব্যক্তি আরম্ভ হইল তখন অন্তহীন সম্ভাবনারাজিও আরম্ভ হইল, এবং যে-সমস্ত সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তোলা বিশ্বব্যাপী অভিব্যক্তির কাজ, তাহার মধ্যে দিব্য শক্তি-জ্যোতি-শান্তি-আনন্দের অস্বীকৃতি—প্রতীয়মান ও কার্য্যতঃ অস্বীকৃতি তাহার সকল পরিণাম সহ—স্পষ্টতঃ অন্যতম। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে সম্ভবপর হইলে পরেও ইহা গৃহীত হইল কেন, তাহা হইলে মানুষী বুদ্ধি সার্ব্বভৌম সত্যের নিকটতম যে-উত্তর

দিতে পারে তাহা হইল এই যে একত্ব-গত ভগবানের অনেকাধারগত ভগবানে পরিণতির পথে, তাঁহার এই একানেক দুই ভাবের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে একটা স্তরে এই ভয়াবহ সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ একবার আবির্ভূত হইলে ইহা ক্রমবিকাশের ধারাতে অবতীর্য্যমান আত্মাকে আনিয়া দেয় একটা প্রবল আকর্ষণ যাহা ক্রমশঃ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, যে আকর্ষণকে পার্থিব মানুষের ভাষাতে বর্ণনা করা যায় অজ্ঞাতের আহ্বান, বাধাবিপত্তি ও দুঃসাহসিক কর্ম্মের সম্মুখীন হওয়ার আনন্দ, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার ইচ্ছা, অজানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প, আপন সত্তা ও জীবনকে উপাদানস্বরূপ লইয়া অভূতপূর্ব্ব নবীন বস্তু সৃষ্টি করিবার আগ্রহ, বিরুদ্ধতত্ত্বরাজির সামঞ্জস্যবিধানের প্রলোভন--এই সব বস্তুকে মন অপেক্ষা একটা উচ্চতর বৃহত্তর চেতনাতে কার্য্যকরী করিবার লালসাই হইল পতনের কারণ। কেন না, অবতরণোন্মুখ মূল জ্যোতির্ম্ময় সত্তার কাছে একমাত্র অজানা বস্তু ছিল গহ্বরের গভীরতা, অজ্ঞানে ও নিশ্চেতনাতে প্রবিষ্ট ভগবানের অবতরণের সীমা। অপরপক্ষে ছিল ভাগবত ঐক্যের দিক হইতে একটা বিরাট স্বীকৃতি, তাঁহার করুণা ইচ্ছা ও মৈত্রী প্রসূত, একটা পরম উপলব্ধি যে এই বস্তু অবশ্যম্ভাবী- --আর যখন ইহা ঘটিয়াছে তখন ইহাকে চরম পরিণতি অবধি লইয়া যাইতেই হইবে,—একদিক দিয়া দেখিলে ইহার আবির্ভাব এক অবাধ অনন্ত জ্ঞানেরই অঙ্গীভূত,—আর, যখন রাত্রির অন্ধকারে নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তখন একটা নবীন অভূতপূর্ব্ব সূর্য্যোদয়ে নিষ্ক্রমণও নিশ্চিত,—আর, শুধু এই পথেই পরম সত্যের একটা বিশিষ্ট প্রকার অভিব্যক্তি সম্ভবপর,—সেই সত্যের প্রতীয়মান

বিরুদ্ধতত্ত্বচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমপরিণতির বিধানে দিব্য নবরূপে অভ্যুদয়। এই স্বীকৃতিরই অঙ্গীভূত ছিল পরম উৎসর্গের সঙ্কল্প,—অজ্ঞান ও তাহার পরিণামরাজির ভার বহন করিবার জন্য নিশ্চেতনার মাঝে ভগবানের অবতরণ, ক্রুশের ও বিজয়কেতনের মধ্য দিয়া সার্থকতা ও মুক্তির দিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অবতার ও বিভূতিগণের আবির্ভাব। অনির্ব্বচনীয় সত্যের বর্ণনে বড় বেশী রকম প্রতীকের সাহায্য লওয়া হইল! কিন্তু প্রতীকের সাহায্য ব্যতিরেকে বুদ্ধির অতীত রহস্যকে বুদ্ধির সম্মুখে আনা যায় কিরূপে? ব্যক্তি যখন তাহার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং ভাগীদার হইয়াছে বিশ্বগত অভিজ্ঞতার এবং সেই জ্ঞানের যাহা অভেদবোধের মধ্য দিয়া সবকিছুকে দেখে, কেবল তখনই প্রতীকের —পার্থিব ঘটনার সহিত সম্বন্ধ প্রতীকের—পশ্চাতে অবস্থিত পরম সত্যরাজি আপন দিব্য রূপ ধারণ করে এবং প্রতীয়মান হয় সহজ, স্বাভাবিক এবং বস্তুর সারসত্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে। একমাত্র সেই বৃহত্তর চেতনার ভিতরে প্রবেশের দ্বারাই মানুষ ধারণা করিতে পারে যে ঐ চেতনার আত্মসৃষ্টি ও আত্মসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট।

বস্তুতঃ ইহা হইল শুধু অভিব্যক্তির সেইটুকু সত্য যেটুকু আমাদের চেতনাতে আসিয়া দাঁড়ায় যখন তাহা শাশ্বত অনন্ত এবং কালের কাঠামোর মধ্যবর্ত্তী সীমার উপর অবস্থিত, যেখানে ক্রমবিকাশের ভিতরে এক ও বহুর সম্বন্ধ আত্মনির্দ্ধারিত, এমন একটা স্তর যেখানে ভবিষ্য বস্তুচয় প্রচ্ছন্ন, এখনও প্রকাশ্যে ক্রিয়মাণ নয়। কিন্তু বিমুক্ত-চেতনা আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে পারে যেখানে আর সমস্যা থাকে না, সেখান হইতে উহাকে

দেখিতে পারে একটা পরম অভেদবোধের আলোকে, সেখানে বস্তুরাজির স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বয়ম্ভূ সত্যে সবকিছু পূর্ব্বনির্দ্ধারিত এবং আপনা আপনি নিরপেক্ষ চৈতন্য, জ্ঞান ও আনন্দের কাছে প্রমাণীকৃত, যে-আনন্দ সমস্ত সৃষ্টি ও অসৃষ্টির পশ্চাতে অবস্থিত ; ইতি ও নেতি উভয়ই দৃষ্ট হয় অনির্ব্বচনীয় সত্যের দৃষ্টিতে, যে-সত্য তাহাদিগকে বিমুক্ত করে, তাহাদের বিরোধ ভঞ্জন করে। কিন্তু সে-জ্ঞানকে মানবমনের বোধ-গম্য করা যায় না, তাহার জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরাবলী বড় একটা পড়া যায় না, তাহার দীপ্তি বড় বেশী উজ্জ্বল আমাদের চেতনার পক্ষে, কেন না আমাদের চেতনা বিশ্বপ্রহেলিকার জটিলতা ও আঁধার আলোকে এতটা অভ্যস্ত, তাহাতে এতটা জড়িত যে তাহার রহস্য ধরিতে পারে না, তাহার সূত্রকে অনুসরণ করিতে পারে না। সে যাই হোক, যখন আমরা আমাদের সূক্ষ্ম সত্তাতে অন্ধকার ও ঝুটোপুটির ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠি, কেবল তখনই আমরা ইহার পূর্ণ মর্ম্ম বুঝিতে পারি, কেবল তখনই আমাদের আত্মা ছাড়ান পায় ইহার গোলকধাঁধার মধ্য হইতে। মুক্তির সেই উচ্চস্তরে উত্থানই হইল যথার্থ নিষ্ক্রমণের পন্থা, ধ্রুব জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

কিন্তু সেই মুক্তি এবং সেই অতিক্রমণের ফলে যে বিলোপ বা অভি-ব্যক্তির মধ্য হইতে পূর্ণ তিরোধান আসিবেই, এরূপ নয় ; ইহার পরিণাম হইতে পারে কর্ম্মে মুক্তির জন্য প্রস্তুতি—উচ্চতম জ্ঞান ও সুতীব্র শক্তির এমন কর্ম্ম, যাহা বিশ্বকে দিব্যরূপ দিতে পারিবে ও ক্রমবিকাশের প্রেরণাকে সার্থক করিতে পারিবে। ইহা একটা এরূপ উচ্চ ভূমিতে উত্থান, যেখান হইতে আর পতনের সম্ভাবনা নাই, যেখানে আপন

শক্তিতে পক্ষ মেলিয়া নামিয়া আসিবে উপরের জ্যোতি, শক্তি ও আনন্দ।

সৎ-এর সামর্থ্যের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই ভুবনে অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু অভিব্যক্তির স্বরূপ, স্বভাব, নিজস্ব সামর্থ্য, তাহার উপাদানসমূহের বিন্যাস, সব নির্ভর করে সেই চেতনার উপর যাহা সৃজনী শক্তির ভিতরে কাজ করে, নির্ভর করে সেই চেতনাশক্তির উপর যাহা সৎ নিজের মধ্য হইতে উন্মুক্ত করে ভুবনে অভিব্যক্তির জন্য। সৎ-এর স্বভাবই এই যে তাহা আপন চেতনাশক্তিরাজির শ্রেণীবিভাগ ও প্রকারভেদ করিতে পারে, এবং সেই বিভাগ ও ভেদ অনুসারে তাহার জগৎকে নির্দ্ধারিত করিতে পারে কিংবা তাহার আত্মপ্রকাশের পরিমাণ ও সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে। সৃষ্ট বিশ্বভুবন, যে শক্তির আয়ত্তাধীন, তাহারই দ্বারা সীমাবদ্ধ; সেই শক্তি অনুসারেই উহা দেখে ও বাঁচে, যদি বেশী দেখিতে চায়, যদি আরও সমর্থভাবে বাঁচিতে চায় ত তাহা পারে শুধু আরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত কোন বৃহত্তর শক্তির দিকে উন্মুক্ত হইয়া, সেই শক্তির দিকে অগ্রসর হইয়া বা তাহাকে নামাইয়া আনিয়া। ইহাই আমাদের জগতে চেতনার ক্রমপরিণতিতে ঘটিতেছে, নিশ্চেতন জড়পদার্থের জগৎ এই প্রয়োজনের চাপে জাগাইতেছে একটা জীবনীশক্তি, একটা মানস শক্তি, যাহা সৃষ্টির নব নব রূপ তাহার মধ্যে লইয়া আসিতেছে এবং এখনও প্রযত্ন করিতেছে উদ্ভূত করিতে বা তাহার মাঝে নামাইয়া আনিতে কোন অতিমানস শক্তিকে। উপরন্তু ইহা সৃজনী শক্তির একটা গতিবৃত্তি যাহা চেতনার দুই প্রান্তের মধ্যে চলাচল করিতেছে। এক পক্ষে, অন্তরে বা ঊর্দ্ধে একটা নিগূঢ় রহস্য আছে

যাহার মধ্যে রহিয়াছে সকল সম্ভাবনারাজি—জ্যোতি শান্তি শক্তি ও আনন্দ সেখানে চিরদিনই প্রকট, এখানে অবরোধ উন্মোচনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। অপর পক্ষে আর একটা চেতনা আছে, বহির্মুখী, বহিস্তলে বা নিম্নে অবস্থিত, যাহা যাত্রারম্ভ করে প্রতীয়মান বিপরীত তত্ত্বরাজি হইতে—নিশ্চেতনা, জড়তা, অন্ধশক্তির চাপ, দুঃখ, কষ্টের সম্ভাবনা—এবং বাড়িয়া উঠে নিজের মধ্যে উচচ হইতে উচচতর শক্তির আবাহন দ্বারা, যে-শক্তিরাজি তাহাকে তাহার ভুবনকে বৃহত্তর ধারাতে পুনঃস্থষ্টি কবায়—এইরূপ প্রত্যেক পুনঃস্থষ্টি বাহির করিয়া আনে আন্তর সামর্থ্যের কিছু কিছু ভাগ এবং তাহার ফলে উর্দ্ধে অপেক্ষমান পূর্ণতার অবতরণ নিত্য বেশী সম্ভবপব হইয়া উঠে। যে বহির্মুখী ব্যক্তিত্বকে আমরা আমাদের সত্তা বলি, তাহা যতদিন চেতনাব অধস্তন শক্তিচয়ে কেন্দ্রীভূত, ততদিন তাহার জীবনেব, জীবনের লক্ষ্যেব, জীবনের প্রয়োজনের প্রহেলিকা একটা অভেদ্য বহস্যই থাকিবে ; এমন কি যদি সত্যের একটুখানি অংশ বাহ্য মনোময় মানুষের কাছে পৌঁছায় ত তাহাও সে পুরোপুরি ধরিতে পাবে না, হয়ত তাহার কদর্থ করে, অপব্যবহার করে, জীবনে তাহাকে অসত্য করিয়া তোলে। তাহার যে ভর দিয়া চলিবার যষ্টি তাহা নির্দ্ধারিত নিঃসংশয় জ্ঞানের জ্যোতি-নির্ম্মিত ততটা নয়, যতটা ভক্তির অগ্নি দিয়া গঠিত। সে তাহার অক্ষমতা ও অজ্ঞানের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে শুধু মনের সীমার উর্দ্ধস্থ উচচতর চেতনাতে উঠিয়া গিয়া, যাহা এখনও তাহার বোধের অতীত। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া সে যখন একটা নূতন পরাচেতন জীবনের আলোকে প্রবেশ করিবে তখন সে তাহার পূর্ণ মুক্তি ও দীপ্তি লাভ করিবে। নিভৃত